কাব প্রোগ্রাম

চাঁদ তারা ব্যাজ

CHAND TARA BADGE

বাংলাদেশ স্কাউটস

BANGLADESH SCOUTS

চাঁদ তারা ব্যাজ

স্বত্বাধিকারী : বাংলাদেশ স্কাউটস

গ্রন্থনায় : চাঁদ তারা ব্যাজ বই টাস্কফোর্স

সংকলন : স্কাউটার মোঃ আবদুস ছাত্তার এলটি, তালতলী, বরগুনা।

সম্পাদনা : প্রোগ্রাম বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন : স্কাউটার মোঃ মাইনুল হক
দিগন্ত স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৯৭, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০০১,
৩য় সংস্করণ : অক্টোবর, ২০০৩
৪র্থ সংস্করণ : অক্টোবর, ২০০৫
৫ম সংস্করণ : মে, ২০১৭
৬ষ্ঠ সংস্করণ : আগস্ট, ২০১৮

সার্বিক সহযোগিতায়: জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
জাতীয় কমিশনার প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ স্কাউটস
জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস
নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস।
জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান
যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস।
জনাব মোঃ আব্দুস ছাত্তার
লিডার ট্রেনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চল।
জনাব মুহাম্মদ আবু সালেক
পরিচালক (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস।
জনাব এ এইচ এম সামছুল আজাদ
উপ পরিচালক (ফাউন্ডেশন ও স্পেশাল ইভেন্টস)
জনাব শর্মিলা দাস
সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস।

মূল্য : ২০ (বিশ) টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস : ISBN 984-32-1623-1

মুদ্রণে : মাহির প্রিন্টার্স
২২৪/১ ফকিরেরপুল, ১ম গলি, ঢাকা-১০০০

মুখবন্ধ

স্কাউট প্রোগ্রাম বা কর্মসূচী একটি চলমান প্রক্রিয়া। যা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শিশু-কিশোর ও যুব বয়সীদের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। স্কাউটিং যেহেতু জীবনের জন্য শিক্ষা তাই পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী কাব স্কাউট প্রোগ্রাম যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রোগ্রাম বিভাগ স্কাউট, রোভার স্কাউট ও অ্যাডাল্ট লিডারের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ের প্রাপ্ত প্রস্তাব ও মতামত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করে কাব স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশে স্কাউটিংয়ের গোড়াপত্তন থেকে কাব স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। শুরুর দিক সার্বক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বর্তমান সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং বর্তমান জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) জনাব মুহঃ তৌহিদুল ইসলাম এবং জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন)। তবে সকল সময়েই বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রোগ্রাম প্রণয়নের প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে তৎকালীন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের বর্তমান সহ-সভাপতি জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক প্রয়োজনীয় পরামর্শ, দিক নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করে আমাদের অগ্রযাত্রার প্রতিটি পর্যায়কে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই বিভিন্ন পর্যায়ের মতামত ও তথ্য সংগ্রহ করে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ স্কাউটিং কার্যক্রমের প্রথম দশকের শুরুতে কাব স্কাউট, স্কাউট প্রোগ্রাম ও রোভার প্রোগ্রাম প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল।

বর্তমান শাখাভিত্তিক স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকায়ন ও হালনাগাদ করার জন্য প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খানের দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রোগ্রাম বিভাগের কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করেছে।

আনন্দের বিষয় এই যে, প্রথম প্রকাশনার পরবর্তী সময় থেকে কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণ এবং যুগোপযোগী করার দীর্ঘ পরিক্রমনে আরো অনেক নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা নিয়ে প্রোগ্রামকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার জন্য নিজেদের সম্পৃক্ত করে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন-কাব স্কাউট, স্কাউট এবং রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া যার শুরু আছে তবে শেষ নেই।

সমসাময়িক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তির ফলে প্রণীত প্রোগ্রামকে যুগোপযোগী, সুপরিকল্পনা প্রসূত নীতিমালা বলে অভিহীত করা যায়। এই বইয়ে কাব স্কাউট প্রোগ্রামের চাঁদ তারা ব্যাজকে একটি ছকে আবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে সকলে অতি সহজে এবং এক নজরে কাব স্কাউট প্রোগ্রামের চাঁদ তারা ব্যাজ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। অর্জিত জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে কাব স্কাউটরা আরো অধিক বাস্তব ভিত্তিক স্কাউটিং দক্ষতা অর্জন করবে বলে আমার বিশ্বাস। বর্তমান সময়ের কাব স্কাউটদের কাছে চাঁদ তারা ব্যাজ বইটি গ্রহণযোগ্য ও আনন্দদায়ক হলেই আমাদের সকল প্রচেষ্টা সফল ও সার্থক বলে মনে করবো। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরো সমৃদ্ধ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

কাব স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণ ও চাঁদ তারা ব্যাজ বই প্রকাশনায় যাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময়, শ্রম, মেধা ও মনন দিয়েছেন বাংলাদেশ স্কাউটস ও আমার পক্ষ থেকে তাঁদের সকলকে জানাই স্বশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)
বাংলাদেশ স্কাউটস

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১.	ইংরেজিতে প্রতিজ্ঞা বলতে পারা	৬
২.	বাংলাদেশের ইতিহাস জানা	৬
৩.	বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকতে পারা	৯
৪.	বীরশ্রেষ্ঠদের নাম ও জন্মস্থান জানা	১০
৫.	পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে সাহায্য করতে পারা	১৩
৬.	গুড়ি টানা গেরো দিতে পারা	১৪
৭.	হুইপিং বাঁধতে পারা	১৪
৮.	হাত ও বাঁশির সংকেত জানা	১৭
৯.	তাঁবু চেনা ও দুইটি অংশের নাম জানা	২১
১০.	সঞ্চয় করতে পারা	২১
১১.	বাংলা বর্ষপঞ্জি সম্পর্কে জানা	২২
১২.	ধর্ম পালন। (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান)	২৩
১৩.	বি.পির ২নং পিটি সম্পর্কে জানা	২৯
১৪.	জন্মনিবন্ধন সম্পর্কে জানা	২৯
১৫.	পুষ্টি সম্পর্কে জানা	৩০
১৬.	শিশুদের জন্য ক্ষতিকারক বিষয় চিহ্নিত করা	৩৩
১৭.	ঘরের ছোটখাট কাজ করতে পারা	৩৪
১৮.	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস সম্পর্কে জানা	৩৪
১৯.	এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দুটি দেশ সম্পর্কে জানা (সার্ক দেশ ব্যতীত)	৩৬
২০.	শরীরের সীমানা সম্পর্কে জানা	৩৭
২১.	কম্পিউটার জ্ঞান	৩৮
২২.	স্কাউট সিডি অথবা বই থেকে একটি গান শেখা	৩৯
২৩.	পঞ্চইন্দ্রিয়ের খেলায় অংশগ্রহণ	৪০
২৪	ক্যাম্পিং	৫৬

চাঁদতারা ব্যাজ

প্রিয়, কাব স্কাউট বন্ধুর, কাব স্কাউটদের জন্য নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুসারে, ইতোমধ্যে একজন কাব স্কাউট হিসেবে নির্ধারিত তিনটি ব্যাজ অতিক্রম করে তুমি তিনটি দক্ষতা ব্যাজ ও চারটি পারদর্শিতা ব্যাজ কৃতিত্বের সাথে অর্জন করেছ।

এবারে পরবর্তী বা চতুর্থ ধাপে চাঁদতারা দক্ষতা ব্যাজ অর্জন ও সেই সাথে তিনটি পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করে নিজকে একজন কৃতি কাব স্কাউট হিসেবে সন্তুষ্টি লাভ করবে। চাঁদতারা ব্যাজ অর্জনে অনেক নতুন কিছু শিখে তোমার জ্ঞান ভান্ডারকে পূর্ণ করবে। কাঙ্খিত ব্যাজটি অর্জনের পূর্বে তোমাকে সদস্য, তারা ও চাঁদ ব্যাজের বিষয়গুলো পুনঃ পরীক্ষায় পাস করতে হবে এবং চাঁদতারা ব্যাজের বিষয়ের উপর দক্ষতা অর্জন করে আকেলার (কাব স্কাউট লিডার) আস্থা ভাজন হতে হবে।

চাঁদতারা ব্যাজ (সময়কাল ঃ ৪-৬ মাস)

বিষয়ঃ

১. ইংরেজিতে প্রতিজ্ঞা বলতে পারা
২. বাংলাদেশের ইতিহাস জানা
৩. বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকতে পারা
৪. বীরশ্রেষ্ঠদের নাম ও জন্মস্থান জানা
৫. পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে সাহায্য করতে পারা
৬. গুড়ি টানা গেরো দিতে পারা
৭. হুইপিং বাঁধতে পারা
৮. হাত ও বাঁশির সংকেত জানা
৯. তাঁবু চেনা ও তাঁবুর দুইটি অংশের নাম জানা
১০. সঞ্চয় করতে পারা
১১. বাংলা বর্ষপঞ্জি সম্পর্কে জানা
১২. ধর্ম পালন। (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান)
১৩. বি.পির ২নং পিটি সম্পর্কে জানা
১৪. জন্মনিবন্ধন সম্পর্কে জানা
১৫. পুষ্টি সম্পর্কে জানা
১৬. শিশুদের জন্য ক্ষতিকারক বিষয় চিহ্নিত করা
১৭. ঘরের ছোটখাট কাজ করতে পারা
১৮. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস সম্পর্কে জানা
১৯. এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দুটি দেশ সম্পর্কে জানা (সার্ক দেশ ব্যতীত)
২০. শরীরের সীমানা সম্পর্কে জানা
২১. কম্পিউটার জ্ঞান।
২২. জারী/আঞ্চলিক গান গাইতে পারা
২৩. পঞ্চইন্দ্রিয়ের খেলায় অংশগ্রহণ
২৪. মৌখিক সংবাদ প্রেরণের খেলায় অংশগ্রহণ
২৫. প্যাক মিটিংয়ে অংশগ্রহণ
২৬.ক্যাম্পিং/তাঁবুবাস

আপন শক্তি

১। ইংরেজীতে স্কাউট প্রতিজ্ঞা:

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা Robert Stefinsion smith Lord Baden Powel of Gilwel স্কাউটিংয়ের ভিত্তি রচনা করেছেন নীতি, লক্ষ্য, আদর্শ ও পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে। অর্থ্যাৎ কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় স্কাউট আন্দোলন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞা পাঠের মাধ্যমে একজন কাব স্কাউট, স্কাউট পরিবারের সদস্য হয়।

ইংরেজীতে স্কাউট প্রতিজ্ঞা নিম্নরূপ -

I Promise that I will do my best
* to do my duty to God and my country
* to do good to other everyday
* to obey the cub Scout Law

২। বাংলাদেশের ইতিহাস:

প্রিয় কাব স্কাউট বন্ধুর, আমাদের জন্মভূমি বা মাতৃভূমি যার নাম বাংলাদেশ। আমরা প্রাণের চেয়েও এ দেশকে ভালবাসি। সুতরাং আমাদের জন্মভূমি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তকারে হলেও জানা দরকার।

পটভূমি: আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ দীর্ঘ আন্দোলনের কাহিনী সমৃদ্ধ। বহু প্রথিতযশা কীর্তিমান এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন উৎসর্গ করে এ দেশকে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থাপন করেছেন।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চতুরতার সাথে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে এদেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা করে। নবাব সিরাজউদ্দৌরার শোচনীয় পরাজয়ের জন্য দায়ী তার সেনাপতি মীর জাফর আলী খা, তার বড় খালা ঘষেটি বেগম, রায় দূর্লভ, জগৎশেঠ প্রমুখদের গভীর ষড়যন্ত্র ও বৃটিশদের প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্ব।

১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৯০ বছর ইংরেজরা হত্যা, ষড়যন্ত্র, নির্যাতন, নীলচাষ ও গোত্র বিরোধের দ্বারা-মহাদেশবাসীদের মধ্যে বিরোধ ও বিভাজন সৃষ্টি করে স্বার্থান্বেষী মহলের সহায়তা বৃটিশদের রাজত্ব কায়েম রাখে।

এ দেশবাসীকে স্বাধীনতা সচেতন করতে হলে শিক্ষার বিকল্প নাই। এই চিন্তাধারায় রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ সংস্কারমুক্ত হয়ে শিক্ষার বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন।

শিক্ষিত আত্মসচেতন মানুষের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ তথা স্বাধীনতা লাভের চেতনা সৃষ্টি হয় অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে। এ সময় ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তিতুমিরের বাঁশের কেল্লার কাহিনী, ফরায়েজী আন্দোলন ও সাওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহী দেখা দেয়। এই বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা। এর ধারাবাহিকতায় সিপাহী মঙ্গল পান্ডে পশ্চিম বাংলার ব্যারাকপুরে বিদ্রোহ করেন। আস্তে আস্তে দেশ স্বশস্ত্র সংগ্রামের দিকে ধাবিত হয়। ফলতঃ সরাজ আন্দোলন, অসহোযোগ আন্দোলন, স্বশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটে তন্মেধ্যে ক্ষুদিরাম, মাষ্টার দ্যা সূর্যসেন, প্রীতিলতা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজী সুবাস বসু, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাদের কথা ও লিখনী যা অস্ত্রের চেয়েও অধিক কার্যকরী হয়ে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। পাকিস্তানের দুটি অংশ পশ্চিম পাকিস্তান ও অন্যটি পূর্ব পাকিস্তান যা আজকের সার্বভৌম বাংলাদেশ। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলেও পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক-গোষ্ঠী শাসন-শোষনের দ্বারা জর্জরিত করত।

পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠি সর্বপ্রথম আঘাত হানে বাংলা ভাষার ওপর। উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর চাপিয়ে দেয়া হল। কিন্তু বাঙ্গালীরা তা মেনে না নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা কায়েমের জন্য ধাপে ধাপে দুর্বার আন্দোলন পরিচালনা করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত সহ আরো অনেক প্রাণের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। আর এই ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠনের প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু তদানিন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বাঙ্গালীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইয়াহিয়া খান ক্ষমতাতো ছাড়বেই না বরং বাঙ্গালীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য নকশা তৈরী করছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ

ঐতিহাসিক রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) ময়দানে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনা মূলক ভাষণ প্রদান করেন। যার মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে প্রহসনমূলক আলোচনা করতে থাকে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে রণতরি বাবর, আকবর বোঝাই করে মরনাস্ত্র চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে নিয়ে আসে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং হত্যাযজ্ঞ চালায়। ঐ রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। কিন্তু দূরদর্শী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের পূর্বেই বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেস মারফত দেশের সর্বত্র স্বাধীনতা ঘোষণা দেন ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য সকলকে নির্দেশ দেন। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল হান্নান বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ২৬ মার্চ ভোর রাত হতে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বারবার পাঠ করে শোনান।

২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, জনাব তাজউদ্দিন আহাম্মেদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং কর্নেল আতাউল গনি ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। সমগ্র দেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। এ মুক্তিযুদ্ধে পাশ্ববর্তী দেশ ভারত বাংলাদেশকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সম্পূর্ণ বিজয় অর্জিত হয়। ৯০ হাজার পাকিস্তানী হানাদার সৈন্য মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। এই যুদ্ধে কিশোর, যুবক, পুলিশ, আনসার, ইপিআর (বর্তমান বিজিবি), সেনাবাহিনী, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, নারীসহ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অংশগ্রহণ করে। ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস হিসেবে আমরা শ্রদ্ধার সাথে পালন করি এবং সকল শহীদদের শ্রদ্ধা ও স্মরণ করার পাশাপাশি আমাদের লাল সবুজ পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করি।

আপন শক্তিঃ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে বিভাগের নাম ও জেলা সমূহের নাম জানবে। মানচিত্রের মধ্যে কোন বিভাগ কোথায় থাকবে তা জানবে, মানচিত্রের মধ্যে কোথায় নিজ বিভাগ ও নিজ জেলা আছে তা খুঁজে বের করবে। মানচিত্রের মধ্যে থেকে সমুদ্র বন্দর সম্পর্কে জানবে এবং মানচিত্র থেকে তা খুঁজে বের করবে। সর্বোপরি বাংলাদেশের মানচিত্র সঠিকভাবে আঁকতে শিখবে।

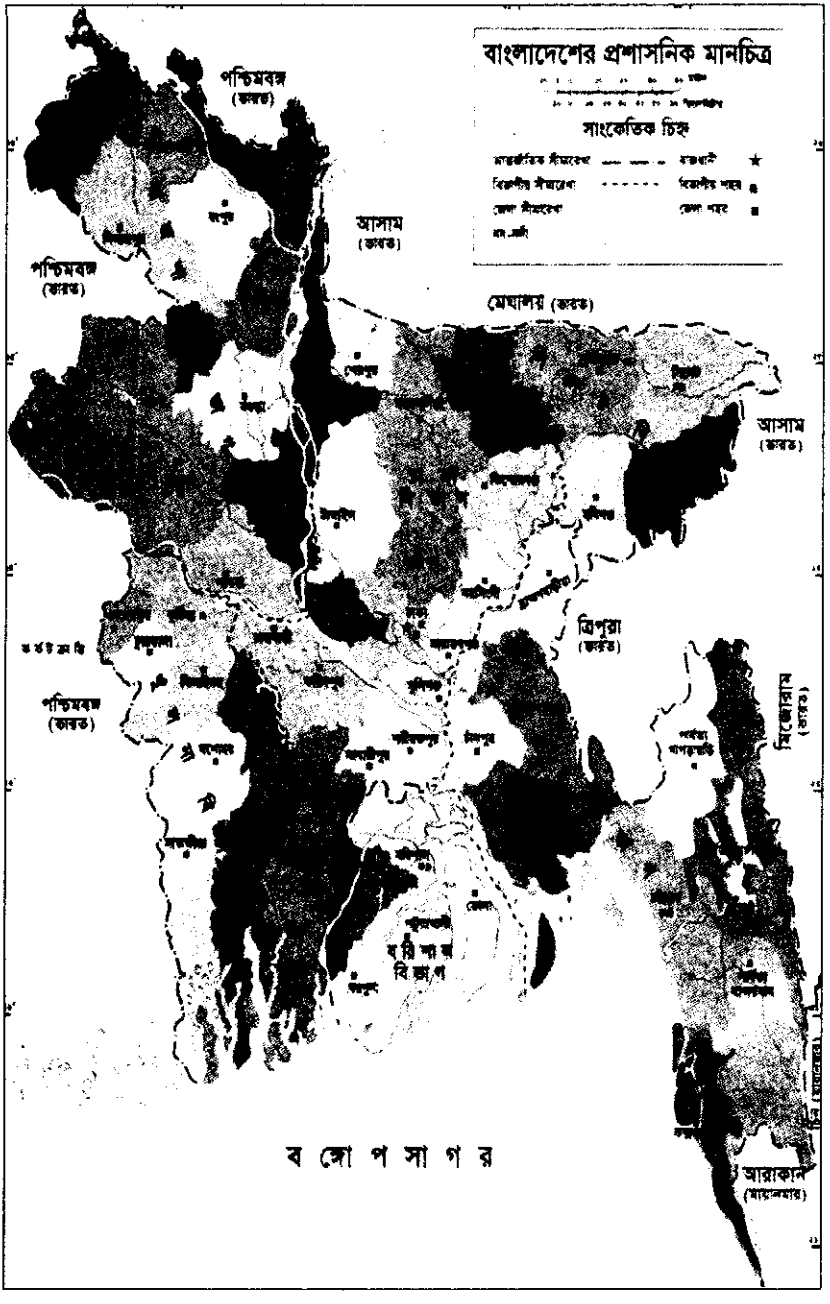
বাংলাদেশের প্রশাসনিক মানচিত্র
সাংকেতিক চিহ্ন
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
আসাম (ভারত)
মেঘালয় (ভারত)
ত্রিপুরা (ভারত)
মিজোরাম (ভারত)
আরাকান (মায়ানমার)
ব ঙ্গো প সা গ র

৪। বীরশ্রেষ্ঠদের নাম ও জন্মস্থান জানা।

"বীরশ্রেষ্ঠ" বীরত্বের জন্য প্রদত্ত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সামরিক পদক। যুদ্ধ ক্ষেত্রে অতুলনীয় সাহস ও আত্মত্যাগের নিদর্শন স্থাপনকারী যোদ্ধার স্বীকৃতিস্বরুপ এই পদক দেয়া হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ সাতজন মুক্তিযোদ্ধাকে এই পদক দেয়া হয়েছে।

❖ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল ঃ

জন্ম ঃ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭
জন্মস্থান ঃ পশ্চিম হাজিপুর, দৌলতখান, ভোলা।
পিতার নাম ঃ হাবিবুর রহমান মন্ডল
মাতার নাম ঃ মোসাম্মৎ মালেকা বেগম
কর্মস্থল ঃ সেনাবাহিনী
মৃত্যু ঃ– ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১
কবর/ সমাধিস্থল ঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়ার আখাউড়ার দরুইন গ্রামে।
যেভাবে শহীদহন ঃ– ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর অভিযান প্রতিহত করতে গিয়ে শহীদ হন।

❖ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ ঃ

জন্ম ঃ ০১ মে, ১৯৪৩ সালে
জন্মস্থান ঃ সালামতপুর, কামারখালী, মধুখালী, ফরিদপুর।
পিতার নাম ঃ মুন্সী মেহেদী হাসান
মাতার নাম ঃ মোছাঃ মকিদুন্নেসা
কর্মস্থল ঃ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস (ই.পি. আর)
পদবী ঃ ল্যান্স নায়েক
মৃত্যু ঃ– ২০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে রাঙামাটির নানিয়ার চরে
কবর/ সমাধিস্থল ঃ পার্বত্য জেলা রাঙামাটির নানিয়ার চরে।
যেভাবে শহীদ হন ঃ ২০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে রাঙ্গামাটি ও মহালছড়ির সংযোগপথ বুড়িঘাট এলাকায় চিংড়ি খালের দুই পাশে নির্মিত প্রতিরক্ষা ব্যুহ অক্ষুন্ন রাখতে গিয়ে হানাদার বাহিনীর গুলিতে শাহাদাত বরন করেন।

❖ **ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ঃ**

জন্ম ঃ ২৯ অক্টোবর, ১৯৪১ সালে
জন্মস্থান ঃ "মোবারক লজ" ১০৯ আগা সাদেক রোড, ঢাকা।
পিতার নাম ঃ মৌলভী আবদুস সালাম
মাতার নাম ঃ সৈয়দা মোবারকন্নেসা খাতুন।
কর্মস্থল ঃ বিমান বাহিনী
বিমান বাহিনীতে যোগদান ঃ ১৯৬১ সালে
পদবী ঃ লেফটেন্যান্ট
মৃত্যু ঃ ২০ আগষ্ট, ১৯৭১ সালে
কবর/ সমাধিস্থল ঃ পাকিস্তানের করাচির মৌকিপুর মাশরুব বিমান ঘাটিতে ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে মিরপুর বুদ্ধিজীবি কবরস্থানে। যেভাবে শহীদ হন ঃ স্বাধীনতা যুদ্ধচলাকালীন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর নিজ দেশে ফিরে মুক্তিযোদ্ধাদের বিমান সমর্থন দেবার চিন্তা করেন। সুযোগ বুঝে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর মশরুরঘাটি থেকে টি-৩৩ জঙ্গীবিমান ছিনিয়ে নেন। এবং বাংলাদেশের পথে রওনা দেন। কিন্তু সিন্ধু প্রদেশের মরু অঞ্চলে বিমানটি বিধস্থ হলে তিনি শহীদ হন।

❖ **ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ ঃ**

জন্ম ঃ ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ সালে
জন্মস্থান ঃ নড়াইল জেলার মহিষখোলা গ্রামে।
পিতার নাম ঃ মোঃ আমানত শেখ
মাতার নাম ঃ মোছাঃ জেন্নাতুন্নেসা
কর্মস্থল ঃ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেস (ই.পি. আর)
ই.পি. আর এ যোগদান ঃ ১৯৫৯ সালে
পদবী ঃ ল্যান্স নায়েক
মৃত্যু ঃ ০৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সালে
কবর/ সমাধিস্থল ঃ যশোরের গোয়ালহাটি নামক স্থানে ছিল বর্তমানে বাংলাদেশের মিরপুর বুদ্ধিজীবি কবরস্থানে।
যেভাবে শহীদ হন ঃ ১৯৭১ সালের ০৫ সেপ্টেম্বর ৮ নম্বর সেক্টরে স্থায়ী টহলে নিয়োজিত থাকায় আক্রমনের মুখে পড়েন। সঙ্গীদের বাঁচাতে গিয়ে সম্পূর্ণ একাকী পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সঙ্গীদের পালিয়ে যেতে সাহায্যে করেন।

❖ সিপাহী হামিদুর রহমান ঃ

জন্ম ঃ ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩ সালে
জন্মস্থান ঃ ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার খালিশপুর গ্রামে।
পিতার নাম ঃ আব্বাস আলী মন্ডল
মাতার নাম ঃ মোসাম্মাৎ কায়সুন্নেসা
কর্মস্থল ঃ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেস (ই.পি. আর)
সেনাবাহিনীতে যোগদান ঃ ১৯৭০ সালে
পদবী ঃ সিপাহী
মৃত্যু ঃ ২৮ অক্টোবর, ১৯৭১ সালে

কবর/ সমাধিস্থল ঃ ভারতের আমবাসা নামক স্থানে ছিল বর্তমানে বাংলাদেশে মিরপুর বুদ্ধিজীবি কবরস্থানে।
যেভাবে শহীদহন ঃ ১৯৭০ সালের ০২ অক্টোবরে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। যুদ্ধ আরম্ভ হলে একদিনের জন্য তিনি মায়ের সাথে দেখা করতে আসেন। ফিরে গিয়ে তিনি ৪ নং সেক্টরে মৌলভী বাজারস্থ কমলগঞ্জের ধলইতে যুদ্ধ করেন এবং পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদাত বরন করেন।

❖ মোহাম্মদ রুহুল আমিন ঃ

জন্ম ঃ ১৯৩৪ সালে
জন্মস্থান ঃ নোয়াখালী জেলার,
সোনাইমুড়ি উপজেলার বাঘপাঁচড়া গ্রামে।
পিতার নাম ঃ মোঃ আজহার পাটোয়ারি
মাতার নাম ঃ মোছাঃ জুলেখা খাতুন
কর্মস্থল ঃ নৌবাহিনী
পদবী ঃ ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার
মৃত্যু ঃ ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে

কবর/ সমাধিস্থল ঃ খুলনার রূপসা নদীর তীরে।
যেভাবে শহীদ হন ঃ– মুক্তিযুদ্ধে নৌবাহিনীর জাহাজ বি এস এস পদ্মার স্কোয়াডন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে হানাদার বাহিনীর বিমান হামলায় জাহাজের ইঞ্জিনে আগুন লেগে পুড়ে শাহাদাত বরণ যান।

❖ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ঃ

জন্ম ঃ ৭ মার্চ, ১৯৪৯ সালে

জন্মস্থান ঃ বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার রহিমগঞ্জ গ্রামে।

পিতার নাম ঃ আবদুল মোতালেব হাওলাদার

মাতার নাম ঃ মোসাম্মৎ সাফিয়া বেগম

সেনাবাহিনীতে যোগদান ঃ ১৯৬৭ সালে

কর্মস্থল ঃ সেনাবাহিনী

পদবী ঃ ক্যাপ্টেন

কবর/ সমাধিস্থল ঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ প্রঙ্গনে

মৃত্যু ঃ ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে

যেভাবে শহীদ হন ঃ ১৯৭১ সালে ডিসেম্বরে চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৭ নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেন। পাক-বাহিনী বেগতিক দেখে পশ্চাৎ গমন করে এবং মুক্তিবাহিনী পলায়নরত পাক বাহিনীকে ধাওয়া করে। সে সময় পাক-বাহিনীর একটি বুলেট কপালে বিদ্ধ হলে তিনি শহীদ হন।

৫। পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে সাহায্য করা:

প্রিয় কাব বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই জান প্যাক মিটিং এ কিংবা অন্য কোন স্কাউট অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করা হয়ে থাকে। সাধারনত কাব স্কাউট লিডার এই অনুষ্ঠানগুলো আয়োজন করে থাকেন। পতাকা দন্ড স্থাপন, দন্ডে দড়ি বাঁধা, এবং পতাকা দড়িতে বাঁধা ইত্যাদি কাজ তারা করে থাকেন। তুমি কাব স্কাউট লিডারকে এসব কাজে সহযোগিতা করবে। তাছাড়া অন্যান্য কাবের সহযোগিতায় পতাকা দন্ড বয়ে আনা, পতাকা ভাঁজ করে রাখা ইত্যাদি ছোটখাট কাজগুলো তুমি করতে পারো। তোমাদের সহায়তা পেয়ে তোমার কাব স্কাউট লিডার কম কষ্টে ও সহজে স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজটি সুন্দরভাবে করতে পারবেন। অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে আবার পতাকা ভাঁজ করে রাখা পতাকা দন্ড তুলে স্কাউট ডেনে সযত্নে রাখা ইত্যাদি কাজেও তুমি সহযোগিতা করতে পারো। তবে এসকল ভাল কাজের জন্য তোমার অবশ্যই আগ্রহ থাকতে হবে। জোর করে বা মনের বিরুদ্ধে কখনো কোন কাজ করানো যায় না, তুমি যদি স্বেচ্ছায় এই সকল কাজ করার জন্য এগিয়ে আস তবেই তুমি নিজেকে একজন ভাল মানুষে পরিনত করতে সক্ষম হবে এবং শিক্ষক সহ সবাই তোমাকে ভালোবাসবেন।

চেষ্ঠা করি

দড়ির কাজ ঃ

প্রিয় কাব বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই জেনেছো স্কাউটিং কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে দড়ির কাজ। অর্থাৎ নিজের দক্ষতা অর্জনের জন্য যে সকল বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন করতে হয় তার মধ্যে দড়ির কাজ অন্যতম। তাহলে চাঁদ ব্যাজে নিশ্চয়ই তোমরা তাঁবুগেরো (রাউন্ড টার্ন এন্ড টু হাফ হিচেস) এবং পাল গেরো (শীট বেন্ড) বাঁধা ও ব্যবহার সর্ম্পকে জেনেছো। নিম্নে বর্ণিত গেরো ও হুইপিং চাঁদ তারা ব্যাজে শিখতে হবে।

৬। গুড়ি টানা গেরো বা টিম্বার হিচ (TIMBER HITCH) দিতে পারা এবং ব্যবহার জানাঃ

দড়ির স্থির প্রান্ত বাম হাতে রাখ এবং ডানহাতে চলমান অংশে দিয়ে কাঠের গুড়ি বা অন্য কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে একবার প্যাঁচ দাও। এখন একবার প্যাঁচ দেয়া শেষ হলে দড়ির চলমান প্রান্ত দিয়ে আরেকটি হাফ হিচ দাও। এবার হাফ হিচ দেয়া শেষ হলে দড়ির চলমান প্রান্ত দিয়ে নিজ মূল দড়ির অংশে অন্তত পক্ষে ৫-৭ বার পেঁচিয়ে যাও। এভাবে টিম্বার হিচ বা গুড়ি টানা গেরো বাঁধতে হয়।

ব্যবহারঃ কোন বড় গাছের গুড়ি বা ভারী কাঠের টুকরা টেনে আনার জন্য টিম্বার হিচ ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া ডায়াগোনাল ল্যাশিং বাধার আগে টিম্বার হিচ দিয়ে শুরু করতে হয়।

৭। হুইপিং বাঁধতে পারাঃ

হুইপিং (Whipping)

দড়ি একটি অতি সাধারণ জিনিস হলেও এর গুরুত্ব কিন্তু অনেক। কোন জিনিস বাঁধতে হলে দড়ি বা সুতা দিয়ে গেরো দিতে হয়। দড়িকে যেখানে সেখানে অগোছালো অবস্থায় ফেলে রাখলে দড়ি নষ্ট হয় যায়। তাই দড়িকে সুন্দর ভাবে প্যাঁচিয়ে ভাঁজ করে রাখতে হবে। কিন্তু দড়ির মুখ খুলে গিয়ে যদি তন্তু ছড়িয়ে পড়ে তবে কাজের অসুবিধা হবে এবং আস্তে আস্তে পুরো দড়িটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

সেজন্য স্কাউটরা দড়ি দিয়ে কাজ করার আগেই দড়ির মুখটি সরু সুতা দিয়ে সুন্দর করে বেঁধে নেয়। আর তাকেই বলে হুইপিং।

স্কাউটিং পরিভাষায় দড়ির মুখ বাধাকে হুইপিং বলে। মুখ খুলে গিয়ে তন্তু ছড়িয়ে দড়ি যাতে কাজের উপযোগিতা না হারায় সে জন্য দড়ির মুখকে কোন সরু সুতা দিয়ে বেঁধে রাখার নাম হুইপিং।

স্কাউটিং এ সাধারণত তিন ধরনের হুইপিং ব্যবহার করা হয়। যথাঃ

১। কমন হুইপিং (Common Whipping)

২। ওয়েস্ট কান্ট্রি হুইপিং (West Country Whipping)

৩। সেইল মেকার্স হুইপিং (Sail Makers Whipping)

স্কাউটিং এ যেসব হুইপিং ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা বাঁধার কৌশলে বিস্তারিতভাবে নিচে বর্ণনা করা হলো ঃ

১। কমন হুইপিং (Common Whipping)

যে দড়ির মুখ বাধতে হবে সে দড়ির সাথে ৪০ সে.মি একটি লম্বা সুতার একপ্রান্তে একটি বাইট তৈরি বাইটের অংশটি দড়ির মাথায় কিছুটি উপরে অপর দুটি প্রান্তকে (এই দুটি প্রান্তের একটি বেশ বড় এবং অপরটি ছোট থাকবে) দড়ির নিচে স্থির প্রান্তের উপর চাপ দিয়ে ধরতে হবে (চিত্র নম্বর ঃ ১)। এরপর মোটা সুতার বড় অংশ দিয়ে ঐ সুতার ছোট প্রান্তসহ মূল দড়ির নিচের দিক থেকে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে উপরের দিকে যেতে হবে (চিত্র নং-২)

মোটা সুতা দিয়ে মূল দড়িকে প্যাঁচানো শেষ হলে দড়ির প্রান্তকে বাইটের যে অংশ মূল দড়ির শেষ প্রান্তে ছিল তার মধ্যে ঢুকিয়ে মোটা সুতার যে অংশ মূল দড়ির নিচে স্থির অংশের উপর আছে তাকে ধরে টান দিতে হবে চিত্র নম্বর ঃ ৩)।

এভাবে টানলে বাইটের যে অংশ মূল দড়ির শেষ প্রান্তে ছিল তা ভেতরে চলে যাবে। এভাবে কমন হুইপিং দিতে হয়। হুইপিং দেয়া শেষ হলে মোটা সুতার যে অংশ বাইরে আছে তা এবং মূল দড়ির প্রান্তভাগে যে তন্তুগুলো বাইরে আছে। সেগুলো সুন্দরভাবে ধারাল কাচি অথবা ছুরি ব্লেড দিয়ে কেটে দিতে হবে (চিত্র নং-৪)।

২। **ওয়েস্ট কান্ট্রি হুইপিং (West Country Whipping)**ঃ ৪০ থেকে ৫০ সে. মি লম্বা একটি মোটা সুতা দিয়ে মূল দড়ির শেষ প্রান্তে ৩ সে.মি. নিচে মোটা সুতার মধ্যভাগ মূল দড়ির ঠিক মধ্যের অংশ রাখতে (চিত্র নং-৫)। এরপর মোটা সুতা দিয়ে মূল দড়ির উপর পর্যায়ক্রমে একবার সামনের দিকে পরবর্তীতে পেছনের দিকে অর্ধেক গেঁরো বাঁধতে বাঁধতে নিচের দিক থেকে উপরের অংশ যেতে হবে। মূল দড়ির প্রান্তভাগ গিয়ে মোটা সুতার মাথার দুটিকে একটি রীফ নট বেঁধে হুইপিং দেয়া শেষ হলে দড়ির প্রান্তভাগের তন্তুগুলোকে ধারাল কাচি অথবা ছুরি বা ব্লেড দিয়ে কেটে দিতে হবে।

৩। **সেইল মেকার্স হুইপিং (Sail Makers Whipping)** ঃ তিনগুণ বিশিষ্ট (দড়ি তৈরি করবার জন্য একই রেড বিশিষ্ট তিনটি দড়ি একত্রে পাকিয়ে যে দড়ি করা হয়) দড়িতে সেইল মেকার্স হুইপিং বাঁধলে তা দেখতে সুন্দর দেখায়। চারগুণ বিশিষ্ট দড়িতে এই হুইপিং দিতে হলে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি গুণকে একত্রিত করে তাকে তিনগুণ বিশিষ্ট করে নিয়ে হয়। তেমনি পাঁচগুণ বিশিষ্ট দড়ি হলে পরস্পর পাশাপাশি অবস্থিত দুটি গুণকে একত্রিক করে তাকে তিনগুণ বিশিষ্ট করে নিতে হয়

যে দড়ির মাথায় হুইপিং দেয়া হবে সেই দড়ির মাথার কিছু অংশের (২-৩ সে.মি. পরিমাণ) পাক খুলে ফেলতে হবে। ৫০ থেকে ৭০ সে.মি. লম্বা মোটা সুতার এক প্রান্তকে ১৫-১৬ সে. মি. ভাঁজ করে মূল সুতার উপর রাখতে হবে। ভাঁজ করা সুতায় যে লুপ তৈরি হবে তা মূল দড়ির যে কোন একটি গুণের মধ্যে ঢুকিয়ে সুতার চারটি অংশকে মূল দড়ির স্থির প্রান্তের উপর রাখতে হবে। এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সুতার প্রান্তের একটি প্রান্ত যেন বেশ বড় থাকে। কারণ এই সুতার বড় অংশকে প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে মূল দড়ির প্রান্তের দিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এরপর মূল দড়ির সাথে মোটা সুতার তিনটি অংশকে একত্রে রেখে লম্বা সুতা দিয়ে মূল দড়িকে নিচের থেকে উপরে প্যাঁচিয়ে যেতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে প্যাঁচানোর সময় যেন একটি সুতার উপর একটি সুতা উঠে না যায়। আর একটি সুতা থেকে অপর সুতা যেন দূরে দূরে না থাকে। সুতাগুলো যেন পরস্পরের খুব কাছাকাছি থাকে। পেচানো শেষ হলে সুতা দিয়ে যে লুপ তৈরি করা হয়েছিল সেই

লুপকে আবার সেইগুণের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সুতার যে প্রান্ত নিচের দিকে আছে তাকে ধরে টানতে হবে। এভাবে টানলে লুপের মাথার কিছু অংশ পেচানো দড়ির মধ্যে ঢুকে যাবে।

এরপর সুতার যে প্রান্ত নিচে আছে তাকে মূল দড়ির প্রান্তের উপরে এনে যে সুতা দিয়ে মূল দড়িকে প্যাঁচানো হয়েছে সেই সুতার সাথে ডাক্তারী গেরো দিতে হবে। এভাবে সেইল মেকার্স হুইপিং (Sail Makers Whilping) দেয়া যায়। হুইপিং দেয়া শেষ হলে সুতার অতিরিক্ত অংশ এবং হুইপিং দেয়া দড়ির প্রান্তভাগের তন্তুগুলো ধারালো কাচি অথবা ছুরি বা ব্লেড দিয়ে কেটে দিতে হবে।

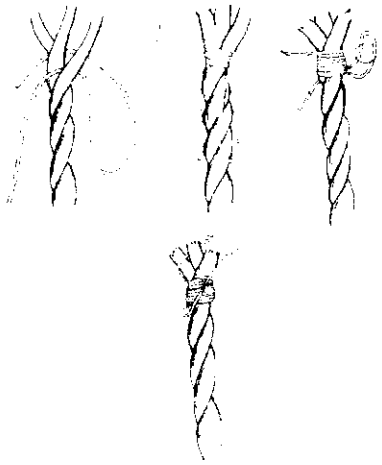

৮। হাত ও বাঁশির সংকেত জানা ঃ

কাবের ডাক ঃ

ক) আকলা অনেকবার প্যাক-প্যাক উচ্চারণ করেন সাথে কাবেরা প্যাক.....ক উচ্চারণ শেষ করে মহাবৃত্তাকারে (Parade Circle)- দাঁড়াবে।

খ) যদি আকেলা একবার প্যাক উচ্চারণ করেন তবে তার অর্থ-সকলে চুপ করবে, পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রস্তুত হবে।

গ) যদি দুইবার প্যাক প্যাক বলে প্যাক.....ক উচ্চারণ করেন তখন সিনিয়র ষষ্ঠক নেতাকে ডাকা হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

ঘ) যদি তিনবার প্যাক প্যাক বলে প্যাক.....ক উচ্চারণ করেন তখন ষষ্ঠক নেতাকে ডাকা হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

বাঁশির সংকেত

১। একটি দীর্ঘ ধ্বনি 'চুপ কর' 'সর্তক হও' 'পরবর্তী সংকেতের জন্য অপেক্ষা কর'।

২। পর পর অনেকগুলো ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ ধ্বনি- 'একত্রিক হও' নিকটবর্তী হও' লাইন করে দাড়াও।

৩। তিনটি ক্ষুদ্র ধ্বনির পর একটি লম্বা ধ্বনি ষষ্ঠক নেতার কাছে এস।

৪। দু'টি ক্ষুদ্র ধ্বনির পর একটি লম্বা ধ্বনি - সিনিয়র ষষ্ঠক নেতার কাছে এস।

৫। পর্যায়ক্রমে বারংবার ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ ধ্বনি- 'বিপদ' সর্তক হও।

৬। পর পর কয়েকটি দীর্ঘ অথচ মন্থর ধ্বনি- 'বাহিরে যাও' আরও দূরে যাও' ছড়িয়ে পড়'।

হস্ত সংকেত ঃ

১। **লাইনের দাঁড়ানো ঃ** সোজা হয়ে দুই হাত পাশে প্রশস্ত অবস্থায় দেখানো, হাত যে দিকে নিচু করা থাকবে ক্রমানুসারে ছোট থেকে বড়রা দাঁড়াবে। ষষ্ঠক/উপদল নেতার পিছনে পাশাপাশি লাইন দিয়ে দাঁড়াবে (চিত্র-১)। এই অবস্থায় থেকে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করলে পিছনের সারির সদস্যরা সামনের ষষ্ঠক/উপদল নেতার বাম পাশে অথবা ষষ্ঠক/উপদল নেতা স্ব স্ব সারির ডান পাশে দাঁড়াবে চিত্র-২)।

২। **ফাইলে দাঁড়ানো ঃ** সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত সামনের দিকে প্রশস্ত অবস্থায় রাখা হাত উচু বা নিচু করে উচ্চতানুসারে দাঁড় করানো। এক হাত উচু করলে ছোট থেকে বড় বাকারে দাড়ানো বুঝাবো (চিত্র-৩)।

৩। **অশ্ব খুরাকৃতিতে দাঁড়ানো ঃ** সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কোমর পর্যন্ত হাত উচু করে ডান হাত বাম হাতের উপর দিয়ে পরস্পর ডানে বায়ে ঘুরালে (চিত্র-৪)।

৪। **বৃত্তাকারে দাঁড়ানো ঃ** দুই হাতের আঙ্গুল নিচের দিকে মাথার তালুতে নিচের দিকে স্পর্শ করলে। (চিত্র-)

৫। **অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়ানো ঃ** সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাতের আঙ্গুলি নিচের দিকে মাথার তালু স্পর্শ করলে (চিত্র-৫)।

৬। **রক সার্কেল/শিলাবৃত্ত ঃ** কোমরে দু'হাত রেখে দাড়ানো (চিত্র-৬)।

৭। **'U' আকারে দাড়ানো ঃ** উভয় বাহু সমকোণী আকারে ভাজ করে ও দুইপাশে উচু করলে (চিত্র-৭)।

৮। **একত্রিত হওয়া ঃ** ডান হাত মাথার উপরে তুলে বাম থেকে বৃত্তাকারে ঘুরালে (চিত্র-৮)।

৯। **থাম** ঃ ডান হাতের তালু সোজা রেখে ভাজ করে অগ্রবাহু শরীরের সাথে সমান্তরাল রাখা (চিত্র-৯)।

১০। **অগ্রসর হওয়া** ঃ কাঁধের নিচে, হাত পিছন দিক হতে সামনের দিকে দুলায়ে পর পর কয়েকবার দেখালে।

১১। **ডবল মার্চ** ঃ হাত মুষ্টিবদ্ধ করে কাঁধ বরাবর হতে উরু পর্যন্ত স্থানে ওপর নিচের দিকে এবং নিচ হতে ওপরের দিকে কয়েকবার দেখালে (চিত্র-১০)।

১২। **কাছে এসো** ঃ দুই হাত পর্যায়ক্রমে বুকের দিকে দুলালে (চিত্র-১১)।

১৩। **বর্গাকারে দাঁড়ানো** ঃ দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ সামনে সমান্তরাল করলে।

১৪। **তাড়াতাড়ি এসো** ঃ হাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় বুক পর্যন্ত নিচু করতে থাকলে (চিত্র-১২)।

১৫। **ধীর এসো** ঃ দুই হাত মুষ্টি খেরা অবস্থায় ওপর থেকে বুক পর্যন্ত নিচু করতে থাকলে (চিত্র-১৩)।

১৬। **ছড়িয়ে পড়া** ঃ দুই হাত তালু নীচের দিক রেখে দুই পাশে প্রসারিত করে নীচু থেকে ওপর দিক করলে (চিত্র-১৪)।

১৭। **এ দিক যাও** ঃ হাতের তর্জুনী নির্দেশিত দিকে যেতে হয় (চিত্র-১৫)।

১৮। **আমাকে ঘিরে একত্রিত হও** ঃ ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে মাথার ওপর রাখলে (চিত্র-১৬)।

১৯। **নেতার পিছনে পরপর দাঁড়ানো** ঃ দুইহাত সামনে প্রসারিত (তালু মাটির দিকে) করলে।

২০। **কাউন্সিল আকারে দাঁড়ানো** ঃ উভয় হাত পাশে কিছুটা প্রসারিত করে হাতে তালু নিচের দিকে রাখলে (চিত্র-১৭)।

২১। **বক্স আকারে দাঁড়ানো** ঃ দুই হাত বুক পর্যন্ত উঠিয়ে এক হাত অন্য হাতের কনুই ধরে উচু করে রাখা (চিত্র-১৮)।

২২। **দলগত বৃত্তাকারে দাঁড়ানো** ঃ উভয় হাত পাশে কিছুটা প্রসারিত করে হাতে তালু নিচের দিকে করে সামনে থেকে পিছনের দিকে দোলালে (চিত্র-১৯)।

২৩। **ষষ্ঠক/উপদলের মুক্ত লাইন** ঃ উভয় হাত সামনের দিকে ভাঁজ করে ওপরের দিকে রাখলে (চিত্র-২০)।

২৪। **ষষ্টক/উপদলের পৃথক লাইন** ঃ উভয় হাত সামনের দিকে ভাঁজ করে ওপরের দিকে মুষ্টিবদ্ধ রাখলে (চিত্র-২১)।

২৫। অনুসরণ কর/ চলে যাও/ঘোরাফেরা করতে পার ঃ এক হাত থেকে নিচে ভূমির সমান্তরাল করলে (চিত্র-২২)।

২৬। **ছুটি/সমাপ্তি ঃ** দুই হাত সমানে রেখে এক হাত অন্য হাতের উপর দিয়ে দোলানো (চিত্র-২৩)।

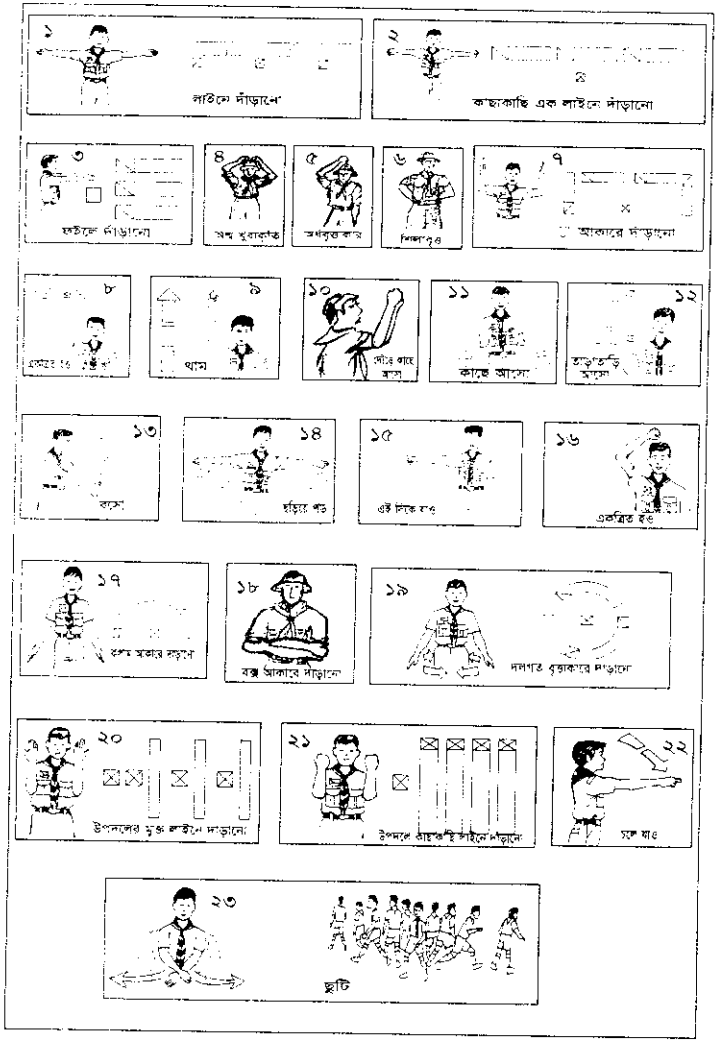

৯। তাঁবু চেনা ও দুইটি অংশের নাম জানা।

প্রিয় কাব স্কাউট বন্ধুরা কাব স্কাউটদের বহিরাঙ্গণ/মুক্তাঙ্গণ কার্যাবলী বাস্তবায়নে তাঁবুতে অবস্থান করতে হয়। সুতরাং তাঁবু সম্পর্কে তোমাদের জানা থাকা দরকার। নিম্নে তাঁবুর বিভিন্ন অংশ প্রদর্শণ করা হল। এ সকল বিষয় জানবে, বিশেষ করে তাঁবুর দুটি অংশের নাম বলতে হবে।

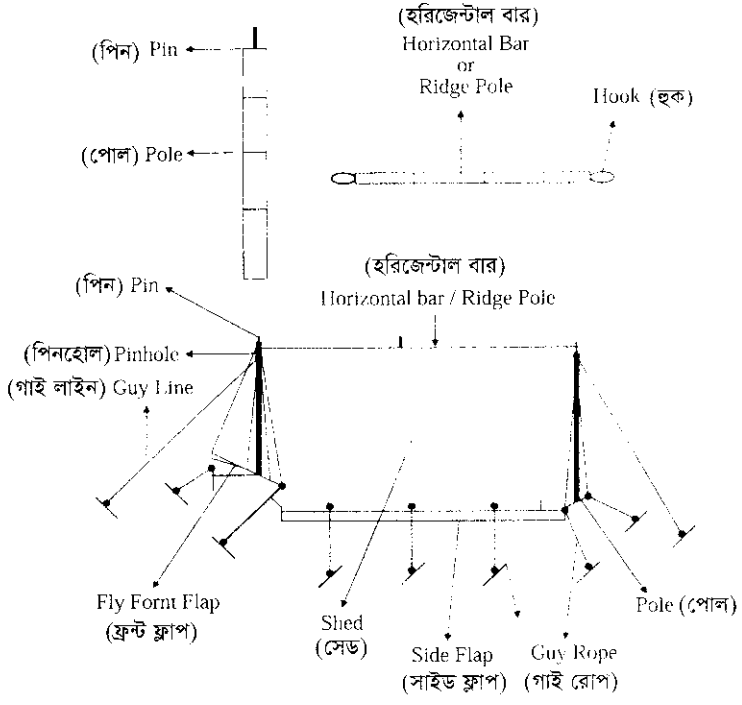

১০। সঞ্চয় করতে পারা:

সঞ্চয় ঃ কমপক্ষে ২০ টাকা সঞ্চয় করা ঃ

প্রিয় কাব স্কাউট বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই চাও তোমাদের নিজের কাছে কিছু টাকা জমা করে যা তোমরা প্রয়োজনের সময় খরচ করতে পার। এর জন্য তোমাদের সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

সঞ্চয়ের উৎস ঃ তুমি বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত অর্থ থেকে আংশিক বাঁচিয়ে কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে পার। যেমন প্রতিদিন স্কুলের টিফিনের খরচ বাঁচিয়ে, জন্মদিনে বা ঈদে বড়দের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ অযথা খরচ না করে জমা করে রেখে। তাছাড়া বাসার পুরনো জিনিস আছে সেগুলো থেকে যেমন-জুতা, সেন্ডেল, কাপড়, খাতা পত্র ইত্যাদি বাবা মায়ের অনুমতি নিয়ে জমিয়ে রেখে। পরবর্তীতে ফেরিওয়ালাদের নিকট বিক্রি করে তা থেকে তুমি সঞ্চয় করতে পার। আবার সংসারের ছোট ছোট কাজ করেও বড়দের মন খুশি করে কিছু পেতে পার। এভাবে তুমি কম পক্ষে ২০ টাকা সঞ্চয় কর। তুমি কিভাবে এ টাকা সঞ্চয় করলে তা তোমার নোট বুকে লিখে রাখ এবং ইউনিট লিডারকে জানাও।

কোথায় খরচ করবে ঃ সঞ্চয়কৃত অর্থ তুমি কিভাবে খরচ করবে। তুমি যখন ক্যাম্পে যাবে তখন ক্যাম্প ফি দেবে। যখন শখের জিনিস কিনতে যাবে তখনও সঞ্চয় কাজে লাগবে। এছাড়াও বার্ষিক সদস্য ফি প্রদানেও সঞ্চয় সহায়তা করবে। এজন্য বাবা-মাকে বিরক্ত না করে তোমার জমানো টাকা খরচ করতে পারবে। আর তোমার নিজের সঞ্চয় থেকে যখন খরচ করবে তখন তুমি মনে খুব আনন্দ পাবে।

১১। বাংলা বর্ষপঞ্জি সম্পর্কে জানা ঃ

বাংলা বর্ষপঞ্জি সম্পর্কে জানা ঃ প্রিয় কাব স্কাউট, প্রতিটি মানুষের তার নিজস্ব একটি মাতৃভাষা আছে। তেমনি আমাদের বাংলাদেশের মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা। আর আমাদের বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের জন্য একটি বর্ষপঞ্জি আছে।
নিম্নে বাংলা বর্ষ পঞ্জি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

বাংলা বর্ষপঞ্জির ইতিহাস ঃ তোমরা সকলে মোগল সম্রাট আকবরের নাম শুনেছ। তার পূর্বে মোগল সম্রাট রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে হিজরি বর্ষপঞ্জি ব্যবহার করতেন। হিজরি বর্ষপঞ্জি ছিল কৃষক শ্রেণীর জন্য একটি সমস্যা, কারণ চন্দ্র ও সৌর বর্ষের মধ্যে ১১/১২ দিনের ব্যবধান। সে সময় চন্দ্র বর্ষ অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা হতো কিন্তু ফসল সংগ্রহ করা হতো সৌরবর্ষ অনুযায়ী। তাই কৃষকদের রাজস্ব প্রদান করতে সমস্যা হতো। এই সমস্যার কথা চিন্তা করে ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর বাংলা বর্ষের প্রবর্তন করেন। এই বর্ষপঞ্জি এর প্রথমে তারিখই এলাহী নামে পরিচিত ছিল।

ইংরেজী বর্ষের মতো বাংলা বর্ষও ৩৬৫ দিনে হয় এবং এর ১২টি মাস। আবার তাদেরকে ৬টি কালে ভাগ করা হয়েছে যথা ঃ
বৈশাখ+জ্যৈষ্ঠ-গ্রীষ্মকাল, আষাঢ়+শ্রাবণ-বর্ষাকাল
ভাদ্র+আশ্বিন-শরৎ কাল, কার্তিক+অগ্রহায়ণ-হেমন্ত কাল
পৌষ+মাঘ-শীত কাল, ফাল্গুন+চৈত্র-বসন্তকাল

আবার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র এই পাঁচটি মাস ৩১ দিনে এবং বাকি গুলো ৩০ দিনে। প্রতি চার বছর পর পর চৈত্র মাস ৩০ দিনের পরিবর্তে ৩১ দিনে গণনা করা হয় এবং বছর শেষ হয় ৩৬৫ দিনে।

"থাকবো ভালো"

১২। ধর্ম পালন। (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান)

ধর্ম

চাঁদ ব্যাজ অর্জন করার সময়ে তোমরা নিজ নিজ ধর্মানুযায়ী বিষয়সমূহ অনুশীলন করেছো। চাঁদ তারা ব্যাজ অর্জন করতে তোমাদের নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী বিষয়সমূহ অনুশীলন করতে হবে। প্রিয় কাব স্কাউট ভাই ও বোনেরা আইন এবং প্রতিজ্ঞা মেনে চলতে হলে তোমাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন বিষয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্য পালন মানেই হচ্ছে ধর্ম পালন।

ইসলাম ধর্ম

ইসলাম ধর্ম অনুসারীদের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ জানতে হবে।

১। কোরআন মাজীদ এর কিছু অংশ পাঠ ঃ

কোরআন আল্লাহর বাণী যা নবী করীম (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, ইহা নিঃসন্দেহে ত্রুটিমুক্ত ও সংশয়হীন বর্ণনার দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন মাজীদ সহী শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা অনেক নেকীর কাজ, মহানবী ইহা শিক্ষা করার ব্যাপারে জোর তাগিদ প্রদান করেছেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন "তোমাদের তা শিক্ষা দেয়"। কোরআন মাজীদের ভাষা আরবি, আরবি অক্ষর শিখলে কোরআন পাঠ করা সম্ভব। তোমরা আরবি ভাষা শিখে পবিত্র কোরআন পাঠের চেষ্টা করবে।

২। আখলাক সম্পর্কে জানা

মানব জীবনে সকল উত্তম আদর্শে নিজেকে তথা কোন ব্যক্তি মাঝে বাস্তবায়ন করা এবং সকল নিকৃষ্ট গুণাবলী থেকে মুক্ত থাকার নামই হচ্ছে চরিত্র।

কাব স্কাউটদের জীবনে আখলাক একটি মহৎগুণ ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ চরিত্র, ভাল হলে দুনিয়ার জীবন সুন্দর ও সুখের হয়। আখিরাতেও শান্তি পাওয়া যায়।

তাই আখলাক বলতে সুন্দর ও উত্তম চরিত্রকে বুঝায়। সুন্দর চরিত্র সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর"। মহানবী (সাঃ) এর চরিত্রে সবচেয়ে ভাল আদর্শ রয়েছে। তাই আমরা তার আদর্শকে অনুসরণ করতে সর্বদা চেষ্টা করব।

৩) নবী ও রাসুল সম্পর্কে জানা ঃ

আম্বিয়া অর্থ পয়গাম্বর, নবী শব্দের অর্থ দূর বার্তাবহাক। আল্লাহতায়ালা মানব জাতিকে তাঁর একত্ববাদ, ভাল-মন্দ, হালাল-হারাম, সৎ-অসৎ, পাপ-পূণ্য, সত্য-মিথ্যা, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য ইত্যাদি পরিস্কার ভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং পালন করিয়ে দেখিয়ে দেয়ার জন্য যুগে যুগে তাদের মধ্য হতে যে সকল উত্তম চরিত্রের লোককে নির্ধারিত ও মনোনীত করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে নবী বা রাসূল বলে এবং তাদের সকলকে একত্রে আম্বিয়া বা পয়গাম্বর বলে। যুগে যুগে অনেক নবী ও রাসূল এসেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

৪) এশা ও জুমার নামাজের নিয়ম জানা ঃ

এশার নামাজ ঃ মুসলিমদের অবশ্য পালনীয় দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অন্যতম। নামাজ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। দৈনিক নামাজগুলোর মধ্যে এটি পঞ্চম। এটি রাতের সময় আদায় করা হয়। এশার নামাজরে ফরজ চার রাকাত। এরপর দুই রাকাত সুন্নত ও তিন রাকাত বিতর নামাজ রয়েছে। ফরজ নামাজের পূর্বে ৪ রাকাত সুন্নত নামাজ পড়া হয়। এটি না পড়লে কোন গুনাহ হবে না। ফরজ অংশ ইমামের নেতৃত্বে জামাতের সাথে আদায় করা হয়।

জুমার নামাজ ঃ প্রতি শুক্রবার দুপুরে অন্যান্যদিনের যোহরের নামাজের বদলে এই নামাজ আদায় করা হয়। সময় একই হলেও যোহরের সাথে জুম্মার নামাজের নিয়মগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। জুম্মার নামাজে দুই রাকাত ফরজ রয়েছে। এছাড়া কিছু সুন্নত নামাজ আদায় করতে হয়। যোহরের মত ব্যক্তি চাইলে এসময় অতিরিক্ত নফল নামাজ আদায় করতে পারে। জুম্মার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা আবশ্যিক এবং তা একাকী আদায় করার নিয়ম নেই। কুরআনে জুম্মার নামাজের সময় হলে কাজ বন্ধ করে নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়ার প্রতি তাগিদ দেয়া হয়েছে। তবে কোনো ব্যক্তি যদি কারণবশত (যেমন খুব অসুস্থ ব্যক্তি) জুম্মা আদায় করতে না পারে তবে তার ক্ষেত্রে যোহরের নামাজ আদায় করা নিয়ম।

হিন্দু ধর্ম

হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ জানতে হবে।

১) চরিত্র গুণ ও নম্রতা সম্পর্কে জানা
২) সত্যই ধর্ম সম্পর্কে জানা

১। চরিত্র গুণ ও নম্রতা সম্পর্কে জানাঃ

চরিত্র হচ্ছে মানব জীবনের একটা বড় গুণ। একজন চরিত্রবান ব্যক্তির দ্বারা মানুষের সাথে মানুষের শান্তি সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় এবং ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্রে

শান্তির সুফল বয়ে আনে। চরিত্রহীন ব্যক্তি শিক্ষিত হলে ও দুর্জন বলে আখ্যায়িত। লেখাপড়া শিখে যদি চরিত্রই গঠনকরা না যায়, তবে সে বিদ্যার কোন স্বার্থকতা নেই। প্রবাদ আছে "সৎ সংগে স্বর্গবাস, অসৎ সংগে সর্বনাশ। বিষধর সাপের মাথায় মহামূল্যবান মণি থাকলেও যেমন তার সংগ কামনা করা উচিত নয়; তেমনি চরিত্রহীন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও তাকে এড়িয়ে চলা উচিত। চরিত্র, মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্মের মাঝেই মানুষের প্রকৃত মূল্য নিহিত। কেবল চরিত্রবান ব্যক্তিই অপরের নিকট থেকে শ্রদ্ধা অর্জন করে এবং এবজন্য সে নিজেকে নিয়ে গর্ব অনুভব করে। পৃথিবীর সব মহামানবদের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে তাদের চরিত্রশক্তি। সত্যবাদী, বিনয়ী, পরদু:খে কাতর ও ন্যায়বান লোকই চরিত্রবান লোক।

চরিত্র গঠনে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। কোন খবর শুনে অনুসন্ধান না করে সাথে সাথে সিদ্ধান্ত না নেয়া, সকল প্রকার মনোমালিন্য ঝগড়া-বিবাদ দুর করে ভাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, কাউকে বিদ্রুপ না করা, কারো দোষ না খোজা, কারো সম্পর্কে পুরোপুরি না জেনে কু-ধারণা পোষণ না করা ইত্যাদি গুণ সৎ চরিত্রের বৈশিষ্ট। সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধ বুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ (রাগ না করা) এ দশটি যার মধ্যে আছে সনাতন ধর্ম অনুসারে তাকে আমরা প্রকৃত চরিত্রবান মানুষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে মানবজীবনের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক সুখ এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য বিভিন্ন উপদেশ, নির্দেশ, রীতিনীতি, আখ্যান-উপাখ্যান লিপিবদ্ধ আছে। হিন্দু ধর্মদর্শনে এবং মহাপুরুষগণের জীবনীতি 'আমি ভালো মানুষ হব এবং অপরকে ভালো হতে সহায়তা দিব, এ কথাটির প্রতিফলন দেখা যায়।

২। সত্যই ধর্ম সম্পর্কে জানা ঃ

যেমন দেখেছি, যেমন শুনেছি এবং যেমন জেনিছি, ঠিক তেমনটাই মনে, কথায় ও কাজে করা কে সত্য বলে। মন যদি সত্য চিন্তা করে, জিহবা যদি সত্য কথা বলে এবং সমগ্র জীবন যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার জন্য ঈশ্বর নানা রুপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন বা নেমে আসেন। যাঁরা সৎ পথে চলেন ঈশ্বর তাঁদের ভালোবাসেন। তাঁদের উন্নতির পথ দেখান এবং সর্বদা তাঁদের মাঝে বিরাজ করেন। অসৎ ব্যক্তিদের ঈশ্বর পছন্দ করেননা এবং শাস্তি দিয়ে থাকেন। ভালো কাজের জন্য তিনি তাঁর ভক্তদের ভালো ফল দিয়ে থাকেন এবং খারাপ কাজের জন্য শাস্তি প্রদান করেন। উপাসনা মানুষের মানসিক অবস্থার উন্নতি করে, মনের কুটিলতা দূর করে এবং মনকে শুদ্ধ করে সত্যের পথে পরিচালিত করে। উপাসনা মনের কামনা, বাসনা, তৃষ্ণা, অহমিকা, আমিত্ব, হিংসা বিদ্বেষ দূর করে। ধার্মিক ব্যক্তি সত্যপ্রিয়।

তিনি কখনও সত্য থেকে দূরে সরে যান না। পরিবারে যদি সর্বদা সত্য কথার চর্চা হয়, কেউ যদি মিথ্যার আশ্রয় না নেয়, তাহলে সে পরিবারের কেউ মিথ্যার আশ্রয় নেবে না। যখন কেউ দুর্বলের উপর অত্যাচার করে, তখন সৎ সাহস নিয়ে দুর্বলের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত। দুর্বলকে বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করা এবং অত্যাচারীকে প্রতিহত করার জন্য সৎ সাহসের প্রয়োজন হয়।

বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি। সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা ধর্মের অঙ্গ। তিনি অথর্ববেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'অসত্য নয়, সত্যেরই জয় হয়; একমাত্র সত্যের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর লাভের পথ প্রসারিত হয়।' যে ব্যক্তি জগতের জন্য তার ক্ষুদ্র 'আমিকে' ত্যাগ করতে পারে, সে দেখে সমস্ত জগৎ তার। যে ব্যক্তি পবিত্র এবং সাহসী, সেই সব কিছু করতে পারে। রাজা দশরথের সত্য রক্ষা করতে রামের রাজত্ব ত্যাগ ও চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাসে গমন সত্যের অনন্য উদাহরণ। আমাদের উচিত সদা সৎপথে চলা, সত্য কথা বলা, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা, কাউকে দুঃখ না দেয়া। সব ধর্মেরই ভিত্তি এক এবং তা হলো সত্য। সত্যই ধর্ম।

বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারীদের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ জানতে হবে।

১) গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে জানা
২) ত্রিপিটক সম্পর্কে জানা ও পাঠ কর

গৌতম বুদ্ধ ঃ গৌতম বুদ্ধ ছিলেন প্রাচীন ভারতের এক ধর্মগুরু এবং তাঁর দ্বারা প্রচারিত ধর্ম বিশ্বাস ও জীবন দর্শনকে বৌদ্ধ ধর্ম বলা হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দিতে গৌতম বুদ্ধের পিতা ছিলেন রাজা শুদ্ধোদন আর মাতা ছিলেন মায়াদেবী।
মায়াদেবী কপিলাবস্তু থেকে পিতার রাজ্যে যাবার পথে ধধুনা নেপালের অন্তর্গত লুম্বিনি গ্রামে বুদ্ধের জন্ম দেন। তাঁর জন্মের সপ্তম দিনে মায়াদেবীর জীবনাবসান হয়। পরে তিনি বিমাতা গৌতমী কর্তৃক লালিত হন। জন্মের পঞ্চম দিনে রাজা ৮ জন জ্ঞানী ব্যক্তিকে সদ্যোজাত শিশুর নামকরণ ও ভবিষ্যৎ বলার জন্য ডাকেন। তাঁর নাম দেওয়া হয় সিদ্ধার্থ- যে সিদ্ধিলাভ করেছে বা যার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, রাজকুমার একদিন সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে যাবেন এবং বোধিপ্রাপ্ত হবেন।

কথিত আছে, একদিন রাজকুমার সিদ্ধার্থ বেড়াতে বের হলে ৪ জন ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। প্রথমে তিনি একজন বৃদ্ধ মানুষ, অতঃপর একজন অসুস্থ মানুষ, এবং শেষে একজন মৃত মানুষকে দেখতে পান। তিনি তাঁর সহিস চন্নকে এ প্রসঙ্গে

জিজ্ঞেস করা হলে চন্ন তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে, এটিই সকল মানুষের নিয়তি। একই দিন কিংবা অন্য একদিন তিনি দেখা পেলেন একজন সাধুর, যিনি মুন্ডিতমস্তক এবং পীতবর্ণের জীর্ণ বাস পরিহিত। চন্নকে এঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন উনি একজন সন্ন্যাসী যিনি নিজ জীবন ত্যাগ করেছেন মানুষের দুঃখের জন্য। রাজকুমার সিদ্ধার্থ সেই রাত্রেই ঘুমন্ত স্ত্রী, পুত্র ও পরিবারকে নিঃশব্দ বিদায় জানিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করেন। সিদ্ধার্থের এই যাত্রাকেই বলা হয় মহানিষ্ক্রমণ।

দুঃখ ও দুঃখের কারণ সম্বন্ধে জানতে সিদ্ধার্থ যাত্রা অব্যাহত রাখেন। বোধিসত্ত্ব তপস্যায় বসার পূর্বে দৈববাণী হয় যে, "বুদ্ধত্ব লাভ করতে গেলে এখানে বসলে চলবে না; এখান থেকে অর্ধযোজন দূরে পত্রবৃক্ষতলে তপস্যায় বসতে হবে।" এরপর দেবগণ বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে করে এগিয়ে নিয়ে যান। মধ্যপথে একজন দেবতা ভূমি থেকে একগাছা কুশ ছিঁড়ে নিয়ে বোধিসত্ত্বকে দিয়ে বলেন যে, এই কুশই সফলতার নিদর্শন স্বরুপ। বোধিসত্ত্ব কুশগ্রহণের পর প্রায় পাঁচ শত হাত অগ্রসর হন এবং পত্রবৃক্ষতলে ভূমিতে কুশগাছটি রেখে পূর্বমুখি হয়ে তপস্যায় বসলেন। কঠোর সাধনার ফলে তাঁর শরীর ক্ষয়ে যায়। কিন্তু এ তাপস্যায় তিনি ভয়, লোভ, ও লালসাকে অতিক্রম করে নিজের মনের উর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করেত সক্ষম হলেন। অবশেষে কঠোর তপস্যার পর তিনি বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত হলেন। তিনি দুঃখ, দুঃখের কারণ, প্রতিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলেন। এ ঘটনাটিই বোধিলাভ নামে পরিচিত। আক্ষরিক অর্থে "বুদ্ধ" বলতে একজন জ্ঞানপ্রাপ্ত মানুষকে বুঝায়। উপাসনার মাধ্যমে উদ্ভাসিত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং পরম জ্ঞানকে "বোধি বলা হয়।

ত্রিপিটক ঃ ত্রিপিটক হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মীয় পালি গ্রন্থের নাম। পালি তি-পিটক হতে বাংলায় ত্রিপিটক শব্দের প্রচলন। তিনি পিটকের সমন্বিত সমাহারকে ত্রিপিটক বোঝানো হয়। পিটক শব্দের অর্থ ঝুড়ি যেখানে কোনো কিছু সংরক্ষণ করা হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতকে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ত্রিপিটক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত হয়। এই গ্রন্থের গ্রন্থনের কাজ শুরু হয়েছিল বুদ্ধের পরিনির্বাচনের তিন মাস পর অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে এবং সমাপ্তি ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ২৩৬ অব্দে। প্রায় তিনশ বছরে তিনটি সঙ্গায়নের মধ্যে এর গ্রন্থায়নের কাজ শেষ হয়। তোমরা বড়দের সহায়তায় ত্রিপিটক পাঠ করা শিখবে ও পাঠ করবে।

খ্রিষ্টান ধর্ম

খ্রিষ্টান ধর্ম অনুসারীদের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ জানতে হবে।

১) বাইবেল সম্পর্কে জানা ও পাঠ করা
২) ঈশ্বর সম্পর্কে জানা

বাইবেল সম্পর্কে জানা ও পাঠ করা ঃ বাইবেল হল খ্রিষ্ট দর্শাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বাইবেল (বিবলজ) শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে বা 'পাওয়া' গ্রীক বিবলিয়া শব্দ থেকে, যার অর্থ ' একটি পুস্তক'। বাইবেল হচ্ছে শাস্তর লিপি বা পুস্তক, ঈশ্বরের বাক্য। বাইবেল হলো ৬৬টি পুস্তকের একটি সংকলন, যা দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত- ৩৯টি পুস্তক সম্বলিত পুরাতন নিয়ম বা ওল্ড টেস্টামেন্ট, এবং ২৭টি পুস্তক সম্বলিত নতুন নিয়ম বা নিউ টেস্টামেন্ট। খ্রিস্টধর্মমদে, ১৬০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ৪০ জন লেখক বাইবেল রচনা করেছিলেন। এরা ছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন লোক। বাইবেলের মুখ্য বিষয়বস্তু বা কেন্দ্রমণি হলেন যীশু। পুরতান নিয়ম মূলত হিব্রু ভাষায় লিখিত, তবে দানিয়েল ও ইষ্রা পুস্তক দুটির কিছু অংশ অরামীয় ভাষায় লিখিত। নুতন নিয়ম গ্রক ভাষায় রচিত। বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এই বাইবেল লিখেছেন। খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন, এই বাইবেল রচনা হয়েছিল খ্রিস্টীয় ত্রিত্ববাদের অন্যতম পবিত্র আত্মার সহায়তায়। পৃথিবীর অনেক ভাষায় বাইবেল অনুবাদ হয়েছে। তোমরা বড়দের সহায়তায় ত্রিপিটক পাঠ করা শিখবে ও পাঠ করবে।

ঈশ্বর ঃ মানুষ ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির শুরু আছে এবং শেষও আছে। আছে জন্ম , আছে মৃত্যু। কিন্তু ঈশ্বরের কোন আদি এবং অন্ত নেই। তিনি ছিলেন, আছেন ও চিরকাল থাকবেন। আমরা মানুষ হিসেবে জন্ম নেওয়ার আগে ছিলাম না, এখন আছি, ভবিষ্যতে আমাদের আত্মা থাকবে কিন্তু দেহ থাকবে না। এটি একটি রহস্য। আমরা অনাদি, অনন্ত ও অসীম ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব হিসেবে এই রহস্যের অর্থ পুরোপুরি বুঝতে পারি না। তা ভেবেও আমরা কোনো কুল কিনারা পাই না। তাই আমরা ঈশ্বরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি, তাঁর উপাসনা করি। তাঁর সকল সৃষ্টি ও তাঁর কাজের জন্য আমরা তাঁর প্রশংসা করি।

অনাদি অনন্ত ইশ্বর সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের কথা ঃ ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত। তিনি আদিতে ছিলেন, এখন আছেন ও চিরদিন থাকবেন। অনাদিকালকে অন্যকথায় বলা হয় শাশ্বতকাল। অনাদি অনন্ত ঈশ্বর আ মাদের সৃষ্টি করেছেন। যেন আমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারি। আমরা সকলে শাশ্বত জীবন পেয়ে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হতে পারব যদি আমরা যীশুর কথা শুনি ও তা মেনে চলি। কারণ পুত্র ঈশ্বরকে অর্থাৎ যীশুকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন পিতা ঈশ্বর। যদি আমরা যীশুর কথা মেনে চলি পিতা ঈশ্বরের কথাও মেনে চলি। যীশু আরও বলেন, আমরা যদি গভীর বিশ্বাস নিয়ে যীশুর দেহ ও রক্ত গ্রহণ করি তবে আমরা শাশ্বত জীবন লাভ করতে পারি। যীশুর দেহ ও রক্ত গ্রহণ করার অর্থ তাঁর সকল আদেশ মেনে চলা। যদি আমরা যীশুর বাধ্য হয়ে চলি তবে শেষদিনে যীশুই আমাদের পুনরুত্থিত করবেন। কারণ তিনি নিজেই পুনরুত্থান করেছেন। পুনরুত্থিত হয়ে আমরা অনাদি অনন্ত

ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত হতে পারি। যীশুর উপর বিশ্বাস রেখেছি বলে আমরা দৈহিকভবে মৃত্যুবরণ করলেও যীশুর মতো করেই সেই শেষ দিনে পুনরুত্থান করব। মোশী জ্বলন্ত ঝোপেপর কাছে উপাস্থিত হয়ে ঈশ্বরকে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন। মোশীর কাছে তিনি বলেন, "আমি সেই 'আমি আছি' যিনি" ইস্রায়েলীয়দের তুমি বলবে: 'আমি আছি যিনি, সেই তিনিই আমাকে অতীতে যেমন ছিলেন, এখন আছেন ও চিরকাল তিনি থাকবেন। তিনি অনাদি অনন্ত।

১৩। বিপি'র ২নং পিটি সম্পর্কে জানা।

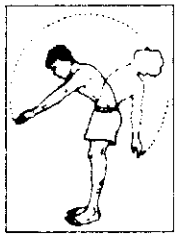

বিপির ২ নং পিটি বক্ষ দেশের জন্য। সোজাবস্থা থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে বাহু স্থির অবস্থায় সামনে নীচের দিকে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিতে হবে যেন অগ্রবাহুর পেছনের দিকটা পাশাপাশি অবস্থায় হাটুর সামনের দিকে থাকে। নিঃশ্বাস গ্রহণ করে ধীরে ধীরে হাত উপরের দিকে উঠাতে হবে। এসময় নাক দিয়ে গভীরভাবে যতটুকু সম্ভব নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। এরপর হাতদুটো ক্রমান্বয়ে পিছন দিকে নিতে হবে এবং শব্দ করে দম ছাড়তে হবে।

স্রষ্টার এই মুক্ত বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে রক্ত সঞ্চালনে সহায়ক হবে। মুখে উচ্চারন করতে হবে Thanks (স্রষ্টার উদ্দেশ্যে)। এরপর আবার সামনের দিকে পূর্বের ন্যায় ঝুঁকে পরে নিঃশ্বাস এমনভাবে ত্যাগ করতে হবে যেন সবটুকু বাতাসই বের হয়ে যায়। এসময় যতবার এরূপ করা হল সেই সঙ্গে Thanks উচ্চারন করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, এই পিটির মূল উদ্দেশ্য কাঁধ, বক্ষ, হৃৎপিন্ড এবং শ্বাস যন্ত্রসহ, আভ্যন্তরীন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশের উন্নয়ন সাধন করা।

১৪। জন্ম নিবন্ধন সম্পর্কে জানা ঃ

জন্মনিবন্ধনের সংজ্ঞা ঃ

জন্মের পর একটি শিশুর নাম, লিঙ্গ, জন্ম তারিখ, জন্ম স্থান এবং তার মা-বাবার পরিচয় জন্ম নিবন্ধকের কার্যালয়ে লিপিবদ্ধ করা/করানোকে জন্ম নিবন্ধন বলে।

জন্ম নিবন্ধক প্রতিষ্ঠান সমূহ ঃ

- ❖ সিটি কর্পোরেশন।
- ❖ পৌরসভা।
- ❖ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- ❖ ইউনিয়ন পরিষদ।
- ❖ বিদেশে জন্মগ্রহণকারীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দূতাবাস।

জন্ম নিবন্ধনের গুরুত্ব ঃ

- ❖ জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব প্রমাণ।
- ❖ বয়স প্রমাণ।
- ❖ সঠিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
- ❖ আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু-কিশোরদের সুবিচার।
- ❖ সঠিক জনসংখ্যা নির্ধারণ।
- ❖ শিশুদের উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন সুবিধা।

সংশোধিত আইনে যেসব ক্ষেত্রে জন্মসনদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ঃ

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে।
২. বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে।
৩. পাসপোর্ট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে।
৪. ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে।
৫. ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে।
৬. সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ক্ষেত্রে।
৭. ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে।
৮. জমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে।
৯. বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষেত্রে।

১৫। পুষ্টি সম্পকে জানা ঃ

পুষ্টি হচ্ছে খাদ্য গ্রহণের প্রতিফলন। পুষ্টি একটি চলমান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রহণকৃত খাদ্য পরিপাক ও শোষিত হয়। পুষ্টি ৩টি কাজ করে-

- ❖ শরীরের তাপ ও শক্তি যোগায়
- ❖ শরীরের বৃদ্ধি ও রোগমুক্তি করে
- ❖ দেহের ক্ষয়পূরণ করে সমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

যেহেতু খাদ্য থেকে পুষ্টি আসে, তাই সুষম খাদ্য সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। পেট ভরে খেলেই শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান পাওয়া যায় না। সুস্থ-শরীরের জন্য চাই পুষ্টিকর ও সুষম খাবার।

সুষম খাবার ঃ

সুষম খাবারে নিম্নলিখিত ছয় প্রকার উপাদান পরিমিত থাকা দরকার।

- ❖ শ্বেতসার বা শর্করা।
- ❖ আমিষ বা প্রোটিন।
- ❖ চর্বি বা তেল।
- ❖ খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন।
- ❖ খনিজ লবন ও
- ❖ পানি।

সকল খাদ্যদ্রব্যে এসব উপাদান সমান ভাবে থাকে না। কোন খাদ্যে এসব উপাদানের কোনটি বেশী আর কোনটি কম থাকে। তাই, সুষম খাবার পেতে হলে বিভিন্ন ধরণের খাদ্যসামগ্রী খাওয়া দরকার।

প্রতিদিন সুষম খাদ্য খেতে হবে। শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকমের পুষ্টি উপাদান পেতে হলে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী মিশিয়ে খাওয়া ভালো।

শ্বেতসার বা শর্করা ঃ

শ্বেতসার বা শর্করা শরীরে শক্তি ও কাজ করার ক্ষমতা যোগায়।

- ❖ চাল, গম, যব, কাউন, প্রভৃতি শস্যে শ্বেতসার বা শর্করা বেশী থাকে।
- ❖ আলু, মিষ্টি আলু, শালগম, কচু, পদ্মমুখী কচু এসব মূল জাতীয় খাদ্যে শর্করা আছে।
- ❖ চিনি ও গুড় অতি পরিচিত শর্করা।
- ❖ এক গ্রাম শ্বেতসার বা শর্করা ৪ ক্যালরী শক্তি দেয়।

আমিষ বা প্রোটিন ঃ

আমিষ শরীর গঠনে সাহায্য করে। শিশুর শরীর বৃদ্ধির জন্য আমিষের প্রয়োজন খুব বেশী।

- ❖ এক গ্রাম আমিষ বা প্রোটিন ৪ ক্যালরি শক্তি যোগায়।
- ❖ সব রকমের মাছ, ডিম, দুধ, মাংস ইত্যাদি। এগুলোকে প্রাণীজ আমিষ বলা হয়।
- ❖ মুসুর, মুগ, মাসখাই, ছোলা বা বুট, মটর, অড়হর, খেসারী ডাল, দেশীসীম, মটরশুটি, কামরাঙ্গা সীম ইত্যাদি। এগুলোকে উদ্ভিজ্জ আমিষ বলা হয়। উদ্ভিজ্জ আমিষকে গরীবের "মাংস খাবার" বলা চলে।
- ❖ চাল, গম জাতীয় শস্যের আমিষ ডালের আমিষের সাথে মিশিয়ে খেলে উদ্ভিজ প্রাণীজ আমিষের মত কাজ করে।

তেল বা চর্বি ঃ

তেল বা চর্বি শরীরে কর্মক্ষমতার উৎস হিসাবে কাজ করে। তুলনামূলকভাবে ইহা শ্বেতসার বা শর্করার দ্বিগুনের অধিক শক্তি সরবরাহ করে।

- ❖ এক গ্রাম তেল ব চর্বি জাতীয় খাদ্য ৯ ক্যালরি শক্তি দেয়।
- ❖ সরিষার তেল, সয়াবিন তেল, তিলের তেল ইত্যাদি।
- ❖ ঘি, মাখন ইত্যাদি।
- ❖ চর্বিযুক্ত মাছ ও মাংসে এ জাতীয় উপাদান আছে।

খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন ঃ

ভিটামিন শরীর রক্ষা করে। এর অভাবে নানা রকম রোগ হয়। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। ভিটামিন অনেক প্রকার। আমাদের খাদ্যে ভিটামিন এ, বি, সি-র ঘাটতি আছে।

ক) ভিটামিন এ'র অভাবে ছেলেমেয়েদের 'রাতকানা' রোগ হয়। অভাব পূরণ না করলে অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

- ❖ সব ধরনের রঙিন শাক-সবজি ও ফল খেলে ভিটামিন 'এ'র অভাব হয় না। মলা ও ঢেলা মাঠে ভিটামিন 'এ' বেশী আছে।

খ) ভিটামিন 'বি' এর অভাবে ঠোঁটের কোনায় ঘাঁ, জিহ্বায় ঘাঁ হয়। আবার কখনও বেরিবেরি রোগ হতে পারে।

- ❖ ঢেঁকি ছাঁটা চাল, ডাল ও শাক-সবজি থেকে ভিটামিন 'বি' পাওয়া যায়।

গ) ভিটামিন 'সি'-র অভাবে স্কার্ভি নামে এক ধরনের রোগ হয়। এ রোগ হলে দাতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে।

- ❖ আমলকি ও পেয়ারা ভিটামিন সি ভরপুর।

শাকেও এই ভিটামিন থাকে, তবে সঠিক পদ্ধতিতে রান্না না করলে এটা নষ্ট হয়ে যায়।

অতএব দেখা যায়, খনিজ লবন ও ভিটামিন জাতীয় খাদ্য উপাদানের জন্য আমাদেরকে শাক-সবজি ও ফলমূল বেশী পরিমানে খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমাদের দেশে নানা ঋতুতে নানা ধরনের শাক-সবজি ও ফলমূল জন্মে থাকে। শরীরকে রোগ মুক্ত রাখতে হলে এসব নানা জাতের পুষ্টিকর রঙিন শাক-সবজি ও ফলমূল বেশী খাবার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

খনিজ লবন ঃ

পুষ্টি রক্ষার জন্য খনিজ লবন দরকারী। আমাদের খাবারে লৌহ, ক্যালসিয়াম ও আয়োডিনের বড় অভাব।

ক) লৌহ জাতীয় খনিজ লবনের অভাবে রক্তস্বল্পতা রোগ হয়। শিশু ও মেয়েরা এ রোগে বেশী ভোগে।

❖ কলিজা, মাংস, মাছ, ডিম, গুড়, লালশাক, সবুজ শাক (যেমন-কালকচু শাক) ইত্যাদিতে লৌহ বেশী থাকে।

খ) ক্যালসিামের অভাবে হাড় ঠিকমত গঠন হয় না। ছোট বাচ্চাদের পা বাঁকা হয়ে যায়।

❖ দুধ, দুধের তৈরী খাবার কাঁটাসহ ছোট মাছ ও কচুশাক, লালশাক, লেটুস পাতা ইত্যাদিতে ক্যালসিয়াম আছে।

গ) খাবারে আয়োডিনের অভাব হলে গলগন্ড বা ঘ্যাগ রোগ হয়।
সামুদ্রিক মাছে আয়োডিন আছে। আয়োডিনযুক্ত লবন খেলে আয়োডিনের অভাব জনিত রোগ হয় না।

পানি ঃ

পানির অপর নাম জীবন। মানবদেহের ৭০% পানি। পানি পুষ্টি উপাদানকে কাজে লাগায়, দেহকে সতেজ রাখে, দূষিত পদার্থগুলো বের করে দেয়। ঘাম, শ্বাস প্রশ্বাসের- সাথে ১/২ লিটার, প্রস্রাবের সাথে ১½ লিটার ও পায়খানার সাথে ১/২ লিটার পানি বের হয়। তাই প্রতিদিন কমপক্ষে ২ লিটার পানি পান করতে হয়।
পানি কম খেলে প্রস্রাবে ইনফেকশন, কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, ঢেকুর, মাথা ব্যাথা, পানিশূণ্যতা, হাত পা অবশ লাগা, মাথা ঘুরানো, দূর্বলতা, চোখে ঝাপসা দেখা, অবসাদগ্রস্থতা, কানে শো শো শোনা, মুখ ও জিহ্বা শুকিয়ে যেতে পারে।

১৬। শিশুদের জন্য ক্ষতিকারক বিষয় চিহ্নিত করা।

প্রিয় কাব স্কাউট তোমরা সবাই শিশু। তোমাদের জন্য ক্ষতিকারক বিষয় সম্পর্কে জানা থাকা দরকার। শিশুর ক্ষতির মূল উৎস হচ্ছে নির্যাতন। এই নির্যাতন শারিরীক, মানসিক ও আবেগীয় ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত কাজ। যা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

শারিরীক ঃ ১। মারধর করা।
২। যৌন নির্যাতন করা।

মানসিক ঃ ১। বকা দেয়া।
২। শাস্তি দেয়া।

আবেগীয় ঃ ১। ভয় দেখানো।
২। লজ্জা দেয়া।

❖ শিশুদের জন্য ক্ষতিকারক বিষয় নিম্নরূপ:

ছেলেদের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক	মেয়েদের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক
১। শিশু শ্রম	১। এক ঘরে করা
২। মারধোর করা	২। মারধোর করা
৩। গালি দেয়া	৩। দোররা মারা
৪। জকি (উটের সহিস)	৪। গালি দেয়া
৫। বিভিন্ন অসামাজিক কাজে শিশুদের জোরপূর্বক সম্পৃক্ত করা (ভিক্ষা, পকেটমার ইত্যাদি)	৫। পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা
৬। পাচার	৬। পাচার
৭। মাদক দ্রব্য ও অস্ত্র আনা নেয়া	৭। ধর্ষণ
৮। অঙ্গহানী করে বিক্রি	৮। ইভটিজিং (উত্যক্ত করা)
	৯। এসিড নিক্ষেপ
	১০। বাসা বাড়ীতে কাজ
	১১। গৃহকর্তা কর্তৃক মারধোর করা
	১২। অঙ্গহানী করে বিক্রি
	১৩। বাল্য বিবাহ
	১৪। যৌতুকের বলি
	১৫। তালাক
	১৬। বহু বিবাহ

১৭। ঘরের ছোটখাট কাজ করতে পারা।

একজন কাব স্কাউট সবসময় একজন সাধারণ শিশুদের থেকে এগিয়ে থাকে। একজন কাব স্কাউটদের কাজ সবসময় পরিপাটি ও গোছানো থাকে। যে তার নিজের কাজ করার জন্য অযথা বড় দেয় কষ্ট দেয় না। তুমি তোমার অবস্থান থেকে নিজের এবং বাড়ীর ছোটখাট কাজ করতে পার। যেমন নিজের পড়ার টেবিল ও পোশাক পরিচ্ছেদ গুছিয়ে রাখা। ছোট ভাই-বোন থাকলে তাদের আদর সোহাগে কাছে রেখে মাকে প্রাতঃকালীন কাজ ও নামাজ পড়ার সহায়তা করা। লেখাপড়ার ফাকে ফাকে রান্নার কাজে, থালা বাসন ধোয়া মোছার কাজে সহায়তা করা। অফিসগামী বাবাকে জামা-কাপড়, কোট, টাই, ছাতা, চশমা, মোবাইল ফোন এগিয়ে দেয়া। নাস্তা ও খাবার টেবিলে খাবার আনা নেয়ায় মাকে সহায়তা করা। মাঠে কর্মরত পিতাকে কৃষি সরঞ্জাম এগিয়ে দেয়া ও কাজ শেষে যথাস্থানে সংরক্ষণ। ঘরবাড়ী আঙ্গিনা পরিস্কার রাখতে সহায়তা করা ইত্যাদি।

১৮। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস সম্পর্কে জানা।

বহু সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্র স্বাধীন হয়। পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রটি ২টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। একটি পশ্চিম পাকিস্তান অপরটি পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে বলে ঘোষণা করে। কিন্তু তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তা মেনে না নিয়ে মায়ের ভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধাপে ধাপে দূর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য মিছিল বের করে। ঐ মিছিলে রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম, সহ আরও অনেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের গুলিতে শাহাদাৎ বরণ করেন। পরিশেষে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠি বাংলাভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তখন থেকে ২১ ফেব্রুয়ারীকে এ দেশের মানুষ শহিদ দিবস হিসেবে পালন করে এবং পরবর্তীতে ১৯৯৯ মাসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার জন্য প্রবাসী মাতৃভাষা প্রেমিক গোষ্ঠির ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী দশজন সদস্য তন্মধ্যে ফিলিপাইনের ২জন, ইংরেজি ভাষাভাষী ১ জন, ফ্যান্তানীজ ভাষাভাষী ১জন, ফার্সি ভাষাভাষী ১জন, জার্মান ১ জন, হিন্দি ভাষাভাষী ২ জন এবং বাঙলা ভাষাভাষী ২জন। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষনীয় যে দুজন বাঙালী প্রস্তাবক তাঁদের নাম হচ্ছে রফিক ও সালাম। ১৯৯৮ সালের ২৯ মার্চ তাঁরা জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের নিকট সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের যৌক্তিকতা এবং দিবস হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারীকে স্বীকৃতি প্রদান ও বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব দেন। জাতিসংঘ থেকে জানান হয় কোন বিশেষ গোষ্ঠি থেকে নয় বরং বাংলা ভাষাভাষী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি উত্থাপন সমীচীন। অতপর মাতৃভাষা প্রেমিক গ্রুপের পক্ষ থেকে জনাব রফিকুল ইসলাম ২৩ জুন ১৯৯৯ বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশনকে যে পত্র লিখেন সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশন তা গ্রহণ করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোন আনুষ্ঠানিকতার জন্য বিলম্ব না করে দ্রুত এ প্রস্তাবটি ইউনেস্কোর সম্মেলনে প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে ২৮ অক্টোবর ১৯৯৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেব ঘোষণার প্রস্তাবটি ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে পৌছে যায়। তারপর দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিশ্বের নানা জাতির নানা ভাষাভাষীর মধ্যে মত বিনিময় ও সর্ব সম্মত যৌক্তিক সমর্থনের ফলে বাংলাদেশ ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের বিরল এ গৌরব অর্জন করে।

১৯। এশিয়া প্যাসিফি অঞ্চলের দুইটি দেশ সম্পর্কে জানা। (সার্ক দেশ বাদে)

১। ফিলিপাইন ঃ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থ্যাৎ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ হচ্ছে ফিলিপাইন। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা। ১৯৪৬ সালের ৪জুলাই স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বেই ১৯৩৪ সালের ২৪ মার্চ সরকার গঠন করায় স্বাধীনতার পূর্বেই ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। দেশটির রাষ্ট্রীয় নাম প্রজাতন্ত্রী ফিলিপাইন। রাজনৈতিক পদ্ধতি হচ্ছে ঃ গণতন্ত্র কিন্তু সরকার পদ্ধতি রাষ্ট্রপতি শাসিত। ফিলিপাইন এক সময় আমেরিকার উপনিবেশ ছিল। দেশটির আয়তন হচ্ছে ২,৯৯,৪০৪ বর্গ কিলোমিটার। লোক সংখ্যা ৭ কোটি ৭১ লক্ষ। ফিলিপাইনের ভাষা ঃ ফিলিপাইনো ও ইংরেজী। মুদ্রা পেসো। ধর্ম ঃ খ্রিষ্টান, রোমান ক্যাথলিক, প্রটেষ্ট্যান্ট ও মুসলিম।

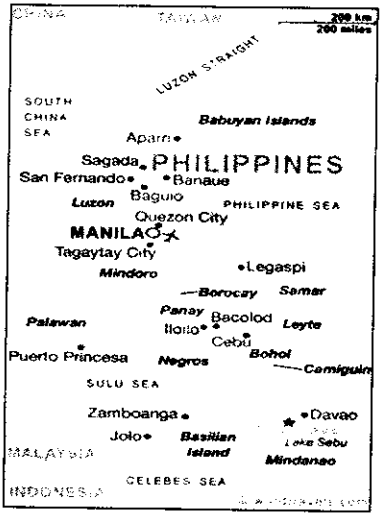

২। ইন্দোনেশিয়া ঃ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ ইন্দোনেশিয়া। দেশটির রাজধানী জাকার্তা। ১৭ই আগষ্ট, ১৯৪৫ সালে নেদারল্যান্ডের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় নাম প্রজাতন্ত্রী ইন্দোনেশিয়া। দেশটি রাষ্ট্রপতি শাসিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান। ইন্দোনেশিয়ার আয়তন হচ্ছে ১৯,০৪,৫৬৯ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ২২ কোটি ২৬ লক্ষ। ভাষা ঃ বাহাসা ইন্দোনেশিয়া, ওলন্দাজ, ইংরেজি, জাভানিজা। মুদ্রা ঃ রুপিয়া । ধর্ম ঃ ইসলাম, প্রোপেস্টান্ট। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ২৮ শে সেপ্টেম্বর ১৯৫০ সালে।

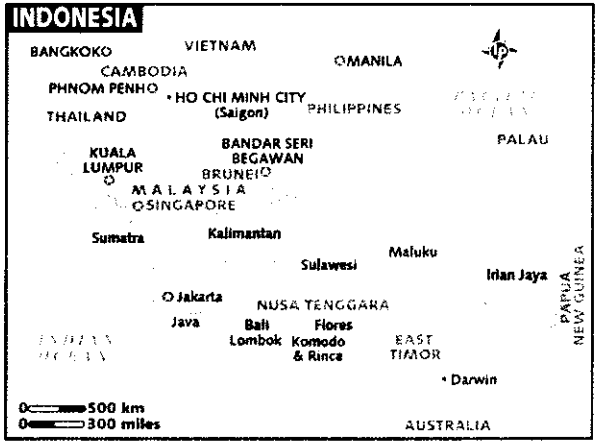

২০। শরীরের সীমানা সম্পর্কে জানা।

তুমি উপরের ছবির মত করে দুহাত সম্প্রসারণ করে তোমার শরীরের সীমানা চিহ্নিত করবে। এই ত্রিভূজ সীমানার মধ্যে অপছন্দনীয় কাউকে আসতে দিবে না। তোমার শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গের নাম জানবে এবং কোন অঙ্গগুলো প্রকাশ করা যাবে কোনগুলো গোপন রাখতে হবে তা পুরোপুরিভাবে জানবে। তোমার শরীরের তিনটি জায়গা আছে, অনেক বড় বিপদ ঘটতে পারে যদি কেউ এগুলো মন্দভাবে ধরে। কখনো কখনো গোসল করিয়ে দেয়ার সময় মা হয়তো ধরতে পারে। অসুখ হলে বাবা মায়ের উপস্থিতিতে ডাক্তার ধরতে পারে। 'ভালো আদর' করার জন্য কখনো কেউ জড়িয়ে ধরতে পারে। কিন্তু তুমি যখনই বুঝবে কেউ 'মন্দ আদর' করবার জন্য ধরেছে তাকে জারে 'না' বলতে হবে। যদি সে না শোনে তাহলে চিৎকার দিতে হবে, সে যে-ই হোক না কেন আর তাকে তুমি যতই ভালেবাসো না

কেন। সেই জায়গা থেকে সরে নিরাপদ কোন জায়গায় চলে আসতে হবে। অবশ্যই মা কিংবা বাবা যাকে তুমি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করো তাকে বলে দিতে হবে।

শরীরের সীমানা

- দু'হাত দিয়ে তৈরি ত্রিভূজ আকার।
  সেই তো শরীরের সীমানা সবার।
- মন্দ আদর রুখবো, নির্যাতন বুঝবো
  সীমানায় হাত বাড়ালে বাঁচার উপায় খুঁজবো।

২১। কম্পিউটার জ্ঞান।

কম্পিউটারের মৌলিক ধারণা

কম্পিউটার কি ঃ কম্পিউটার নিজে নিজে কোন কাজ করার ক্ষমতা নেই। কম্পিউটার প্রস্তুতকারী ও ব্যবহারকারীগণই যন্ত্রটিকে বলে দিচ্ছে তাকে কি কাজ করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে। মূলতঃ উপযুক্ত ও নির্ভুল নির্দেশের প্রভাবে কম্পিউটার জড় পদার্থ হতে গাণিতিক শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রে পরিণত হয়। একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে কম্পিউটারের ক্রমবিকাশ এবং প্রসারতা এত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, আজ জীবনের এমন কোন স্থান নেই যেখানে কম্পিটারের ব্যবহার হচ্ছেনা।

মাউস (Mouse) ঃ

মাউসের মাধ্যমে ক্লিক করে ডাটা ইনপুট করা হয়। মাউসের সাধরণতঃ ডানে ও বামে ২টি বাটন থাকে। কোন কোন মাউসের মাঝখানে একটি স্কল বাটন থাকে।

কী বোর্ড (Key Board) ঃ

কী বোর্ড বিভিন্ন ধরনের কী রয়েছে। কী বোর্ডের কীগুলো দ্বারা ডাটা টাইপ করে কম্পিউটারে ইনপুট করা হয়। কী-বোর্ডে সাধারণ ১০৮-১২০ টি কী থাকে।

স্ক্যানার (Scanner) ঃ

স্ক্যানার এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ছবি বা তথ্য কম্পিউটারে ইনপুট করা হয়।

মনিটর (Monitor) ঃ

কম্পিউটারের যাবতীয় কার্যক্রমকে দেখার জন্য যে পর্দা ব্যবহার করা হয় তাকে মনিটর বলে। মনিটরের মাধ্যমে লেখা ও ছবি দেখতে পাওয়া যা।

প্রিন্টার (Printer) ঃ

কম্পিউটারের তথ্য কাগজের মাধ্যমে পাওয়ার জন্য প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়।

কম্পিউটারে টাইপ করার কৌশল ঃ

কম্পিউটারে টাইপ করতে হলে প্রথমে কম্পিউটার চালু করতে হবে। কম্পিউটার চালু হলে Start গবহঁ থেকে একটি Ms Word File খুলতে হবে। কম্পিউটার চালু করা ও Ms Word File খোলার ব্যাপারে তুমি বড়দের সাহায্য নিতে পার।

এরপর তুমি কি বোর্ডে দেখতে A-Z পর্যন্ত অক্ষর রয়েছে। তোমার নামের বানান লিখ। প্রতিটি অক্ষর আস্তে করে চাপ দিলেই তা মনিটরে দেখা যাবে। তবে নামের প্রথম অক্ষর বড় হাতের লিখতে হলে তোমাকে shift কী চেপে নির্দিষ্ট অক্ষর চাপতে হবে। নামের কয়েকটি অংশ থাকলে প্রত্যেক অংশ লেখার পর Spacebar তুমি বাসায়/স্কুলে তোমার নাম, বাবা-মায়ের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি টাইপ করার চেষ্টা করবে। যেমনঃ

Md Shariful Islam

আনন্দ উল্লাস

১। আরো ১ টি গান শেখাঃ জারী/ আঞ্চলিক গান গাইতে পারা।

ক. আমরা করবো জয়, আমরা করবো জয়
আমরা করবো জয় একদিন...
এই বুকের গভীরে, আমরা জেনেছি
আমরা করবো জয় একদিন।
আমাদের নেই কোন ভয়, আমাদের নেই কোন ভয়
আমাদের নেই কোন ভয় আজকে
এই বুকের গভীরে আমরা জেনেছি, আমাদের নেই কোন ভয় আজকে....
আমরা করবো জয়, আমরা করবো জয়
আমরা করবো জয় একদিন...
এই বুকের গভীরে, আমরা জেনেছি
আমরা করবো জয় একদিন।

খ. We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome some day
oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome some day

We are not afraid
We are not afraid
We are not afraid some day

We are not alone
We are not alone
We are not alone some day

We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome some day

২২। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের খেলায় অংশগ্রহণ করা:

পঞ্চইন্দ্রিয় হচ্ছে চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক। পঞ্চইন্দ্রিয়ের খেলায় ইন্দ্রিয়গুলোর চেতনা শক্তির সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে।

চোখঃ একিট পাত্রে বা ট্রেতে অনেকগুলি জিনিস রাখা থাকে। ট্রেটি কোন কাপড় বা পেপার দ্বারা ঢাকা থাকে। ১-৩ মিনিট সময় দেয়া হয় এর মধ্যে খুব ভালভাবে ট্রেতে রাখা জিনিসগুলি দেখে রাখতে হয়। তারপর ট্রেটি পুনরায় ঢেকে রাখতে হয়। নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি জিনিসের নাম লিখতে পারেন, সেই জীয় হয়। কিমস গেমের মাধ্যমে চোখের খেলা সম্পন্ন হয়েছে যাতে ধী শক্তির বিকাশ সাধিত হয়।

কানঃ আমরা কান দ্বারা কোন শব্দ শুনি। বিভিন্ন বস্তু বা ধাতব শব্দ শুনে আলাদা করে চিনতে পেরে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। যেমন ঃ একটা বদ্ধ ঘরে বিভিন্ন রকম শব্দ করে যথা কাঠের জিনিসের উপর আঘাত করে, পর্যায়ক্রমে টিনের উপর আঘাত করে, তামার বা কাসার পাত্রে আঘাত করা হবে। আড়াল থেকে শব্দ শুনে বলতে হবে কোনটা কিসের শব্দ। সঠিক বলতে পারলে খেলায় জয়ী হবে।

নাক ঃ নাক দিয়ে আমরা ঘ্রান নেই, এটা ঘ্রানশক্তির খেলা।

খেলার নিয়ম ঃ পৃথক পৃথক টুকরো কাপড়ে প্যাচানো থাকে গোলাপ ফুল, গরম মশলা, লেবু, কমলার খোসা ইত্যাদি, এক এক করে গন্ধ শুনে বলতে হবে কোনটা কিসের গন্ধ। সঠিক জিনিসের গন্ধ শুকে জিনিসের নাম বলতে পারলে খেলায় জয়ী হবে।

জিহ্বা ঃ জিহ্বা দ্বারা আমরা সব ধরনের খাবারের স্বাদ গ্রহণ করি। এই স্বাদ গ্রহণের অনুভূতি পরীক্ষা করার জন্য মজার খেলা রয়েছে, যেমনঃ মরিচের গুড়ো, টক, তোতো, গুড়, লবন ইত্যাদি বিভিন্ন স্বাদের জিনিস জিহ্বা দিয়ে পরখ করে বলতে হবে কোনটি কিসের স্বাদ। সঠিক বলতে পারলে খেলায় জয়ী হবে।

ত্বক ঃ ত্বকের এ অনুভূতি দিয়ে শক্ত, নরম বিভিন্ন প্রকার জিনিস সনাক্ত করতে হয়। ত্বক-এর খেলা খেলতে কতগুলো বিভিন্ন ধরনের জিনিস দেওয়া হবে। চোখে না দেখে, হাত দিয়ে স্পর্শ করে জিনিসগুলোর নাম বলতে হবে। যেমন পৃথক পৃথক কাপড়ে বেধে দেওয়া হবে, চাল, ডাল, তুলা ইত্যাদি জিনিস না দেখে হাত দিয়ে স্পর্শ করে নাম বলতে হবে। যে স্পর্শ করে সঠিক জিনিসের নাম বলে দিতে পারবে সে এই ত্বক এর অনুভূতির খেলায় জয়ী হবে।

মৌখিক সংবাদ প্রেরণ ঃ

স্থান ঃ মাঠ, উপকরণ ঃ খাতা ও পেন্সিল

মৌখিক সংবাদ প্রেরণ খেলাটি হচ্ছে কোন সংবাদ বা বাক্য শুনে তা হুবহু মৌখিক ভাবে বলতে পারা। আর এই খেলাটি হচ্ছে দলগত।

খেলার নিয়ম ঃ প্রতিটির ষষ্ঠকের কাবেরা দুই হাত দূরে দূরে একই দিকে মুখ করে একজনের পেছনের আর একজন দাড়াবে। প্রত্যেক ষষ্ঠকের প্রথম কাবের হাতের ১৫ শব্দ বিশিষ্ট (কম/বেশি) একটি লিখিত সংবাদ দেয়া হবে। সে এটি পড়ে মুখস্থ করার সময় পারে ২ মিনিট। তারপর সংবাদের কাগজটি ইউনিট লিডার অথবা খেলার পরিচালকের নিকট ফেরত দেবে। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ২য় জনের নিকট দৌড়ে গিয়ে মুখস্থ সংবাদটি তার কানে বলবে এবং তাকে মুখস্থ করাবে। সংবাদটি ২য় জনের মুখস্থ হলে সে অনুরূপ ভাবে ৩য় জনের কানে কানে বলবে এভাবে সর্বশেষ কাব সংবাদটি শুনে কাগজে লিখে নিয়ে খেলার পরিচালকের নিকট জমা দিবেন। ১০-১২ মিনিটের মধ্যে সংবাদ রিলে করা শেষ করতে হবে। পরিচালক প্রয়োজনে সময় কমাতে বাড়াতে পারবে। সকল ষষ্ঠকের সংবাদ পাওয়ার পর পরিচালক সেগুলো পরীক্ষা করে ফলাফল ঘোষণা করবেন।

আমিও পারি

১। তিনটি পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন

সূর্য গ্রুপ (আবশ্যিক) ঃ - ১টি ব্যাজ
সূর্য গ্রুপের যে দুটি ব্যাজ তারা ও চাঁদ তারা ব্যাজে অর্জন করেছ তা ব্যতীত অবশিষ্ট ২টি ব্যাজ থেকে যে কোন ১টি ব্যাজ অর্জন করতে হবে।
সূর্য গ্রুপ ঃ ১. জনস্বাস্থ্য, ২. সাতার, ৩. নিরাপত্তা, ৪. পরিবেশ সংরক্ষণ

১. জনস্বাস্থ্য ঃ
কথায় আছে স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে টাকা পয়সা ধন-সম্পত্তি এগুলোর সুখ শান্তির কোন মূল্য নেই। তাই কাব বন্ধুরা আমাদের সকলের উচিত স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা। আর তার জন্য আমাদের নিম্নোক্ত কাজ গুলো করতে হবে।

ক. নখ, দাঁত, চুল, চোখ ইত্যাদির যত্ন নিতে পারাঃ
তোমার শরীর সুস্থ্য রাখতে হলে তোমাকে আগে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। আর তার জন্য নিজের স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম গুলো জানতে হবে এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যেমন - চুল, নখ, দাঁত, চোখ ইত্যাদির প্রতি যত্ন নিতে হবে। সে সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলোঃ

নখের যত্ন ঃ নখ পরিস্কার রাখা খুবই প্রয়োজন। হাতের ও পায়ের নখ বড় হলে কেটে পরিস্কার রাখতে হবে। কারণ ধূলাবালি খুব সহজে নখের ভিতর প্রবেশ করতে পারে। সুতরাং সপ্তাহে অন্ততঃ একবার সমান ও মসৃন করে নখ কাটতে হবে।

দাঁতের যত্ন ঃ দাঁত দ্বারা আমরা আমাদের খ্যদ্য বস্তু চিবিয়ে খাই। খাওয়ার পর প্রতিদিন অন্তত দুবার দাঁত ব্রাশ করতে হবে। ব্রাশে টুথপেস্ট অথবা পাউডার ব্যবহার করবে। বছরে অন্ততঃ একবার দাঁতের চিকিৎসকের কাছে দেখিয়ে দাঁত পরীক্ষা করাবে। আহারের পর ভাল করে কুলি করবে। এতে দাঁতে আটকে থাকা খাদ্য বস্তু পরিস্কার হবে। নিয়মিত দাঁত পরিস্কার না করলে মুখে দুর্গন্ধ হবে, নানা রকম অসুখ হবে, অকালে দাঁত নষ্ট হয়ে যাবে, দাঁত পড়ে যাবে। এর হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে দাঁতের যত্ন নেয়া একান্ত প্রয়োজন।

চুল ঃ প্রতিদিন অন্ততঃ একবার গোসল করার সময় ভাল করে চুল ধুবে। সপ্তাহে ১দিন অথবা ২দিন সাবান বা শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিস্কার করতে হবে। ছেলেদের চুল যথা সম্ভব কেটে ছোট রাখতে হবে। চুল অপরিস্কার রাখলে মাথায় খুসকি ও উকুঁন হবে, অকালে চুল পড়ে যাবে।

চোখ ঃ হাত দিয়ে কখনো চোখ রগড়াবে না। পরিস্কার রুমাল ব্যবহার করবে। চোখে কোন কিছু পড়তে পারে। হাত দিয়ে না কচলিয়ে বড়দের সাহায্য নিবে। নরম কাপড় দিয়ে মুছে আনতে হবে। প্রচুর পরিমানে পরিস্কার পানিতে চোখ ধুতে হবে। পরিস্কার রুমাল সাথে রাখবে।

খ. বাসার নিকট একজন ডাক্তারের চেম্বার এবং নিকটস্থ হাসপাতালের টেলিফোন নাম্বার জানাঃ যেকোন মুহূর্তে তোমার পরিবারে কোন সদস্য বা অন্য কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এক্ষেত্রে তোমার বাসার নিকটে ডাক্তারের বাসা বা চেম্বার নম্বর জানা থাকলে বিপদের সময় কাজে লাগতে পারে। আর যদি রোগী স্থানান্তর জরুরী হয়ে থাকে তাহলে অল্প সময়ে এম্বুলেন্সের প্রয়োজন হতে পারে। একমাত্র টেলিফোনের মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করা সম্ভব। আর একজন কাব স্কাউট হিসেবে তোমাদের নিকটস্থ হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় বা ডাক্তারের টেলিফোন নম্বর তোমার জানা অবশ্যই প্রয়োজন।

গ. খাবার স্যালাইন তৈরি ও ব্যবহার ঃ

আধা লিটার বিশুদ্ধ পানিতে এক প্যাকেট স্যালাইন ভালোভাবে মিশিয়ে খাওয়ার স্যালাইন তৈরি করা যায়।

এছাড়াও যদি প্যাকেট স্যালাইন না পাওয়া যায় তাহলে আধা লিটার বিশুদ্ধ পানিতে এক মুঠো গুড় বা চিনি এবং তিন আংগুলের এক চিমটি লবণ ভালভাবে মিশিয়ে স্যালাইন তৈরি করায় যায়।

মনে রাখতে হবে যে প্রস্তুতকৃত প্যাকেট স্যালাইন ১২ ঘন্টার বেশি এবং হাতে তৈরি স্যালাইনই ছয় ঘন্টার বেশি রাখা যায় না। গরম করলে এর উপকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

খাওয়ার নিয়ম ঃ যতবার পাতলা পায়খানা হবে ততবার রোগীকে স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

২ বছরের কমঃ ৫০-১০০ মিলি (১/৪ গ্লাস-১/২ গ্লাস)
২-১০ বছর ঃ ১০০-২০০ মিলি (১/২ গ্লাস-১ গ্লাস)
১০ বছরের উর্ধ্বে ঃ যতটুকু খেতে চায়।

ঘ. পানি বিশুদ্ধ করার কিছু সারাণ পদ্ধতি ঃ

আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, স্বচ্ছ ও দুর্গন্ধ মুক্ত পানিই বিশুদ্ধ পানি নয়। স্বচ্ছ, দুর্গন্ধ মুক্ত পানিতেও থাকতে পারে জীবানু। তাই আমাদের খাবার পানি অবশ্যই স্বচ্ছ, দুর্গন্ধ মুক্ত এবং জীবাণুমুক্ত হতে হবে। আর পানিকে বিশুদ্ধ করার পদ্ধতি রয়েছে এর বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলঃ-

পানি ফুটানো ঃ আমরা যদি ভূ-উপরিভাগের (নদী, পুকুর, খাল) পানি ব্যবহার করি তবে সেই পানিকে প্রথমে সূতি কাপড় বা ভালো ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। অতঃপর এই পানিকে তাপ দিয়ে ফুটাতে হবে। পানি ফুটানোর সময় একটি বিষয় খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, পানি যখন টগবগ করে ফুটতে শুরু করে তখন থেকে অন্তত পরবর্তী ৫ মিনিট পানিকে ফুটতে দিতে হবে। এতে করে পানি জীবাণুমক্ত, পান করা ও রান্নায় ব্যবহার উপযোগী হয়ে উঠবে।

পানিতে ফিটকিরি ব্যবহার ঃ আমরা ফিটকিরি দিয়েও পানি বিশুদ্ধ করতে পারি। প্রায় ১০ লিটার পানি বিশুদ্ধ করার জন্য মাত্র ৩০০ মি.গ্রা. ফিটকিরিই যথেষ্ট। ফিটকিরি দিয়ে পানি বিশুদ্ধ করার জন্য প্রথমে সংগৃহীত পানি সূতি পরিচ্ছন্ন কাপড় বা ভাল ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। অতঃপর ঐ পানিতে প্রতি ১০ লিটারের জন্য ৩০০ মি.গ্রা. হারে ফিটকিরি মিশাতে হবে। ফিটকিরি মিশানো পানি ৮ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। ফিটকিরি পানির সকল খারাপ জীবাণু ও অন্যান্য ক্ষতিকর দ্রবীভূত উপাদান সমূহকে তলানি আকারে নিচে ফেলে দেয়। অতঃপর তলানী ব্যাতীত উপরের জীবাণুমুক্ত পানি আলাদা করে ব্যবহার করতে হবে।

হ্যালোজন ট্যাবলেট ব্যবহার ঃ পানি বিশুদ্ধ করার জেন্য হ্যালোজেন ট্যাবলেট ব্যবহার হয়ে থাকে। এক লিটার পানি বিশুদ্ধ করার জন্য ৬টি হ্যালোজেন ট্যাবলেটের প্রয়োজন হয়।

ঙ) শিশুদের হয় এমন ৬টি মারাত্মক রোগের নাম বলতে পারা ঃ

শিশুরা জন্মের পর থেকেই যে সকল রোগে আক্রান্ত হয় তা হলো- ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, পোলিও, হাম ও যক্ষা। এই সবকটি রোগই সংক্রামক এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান। এই সবকটি রোগই টিকাদানের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

২. সাঁতার ঃ

পানির অপর নাম জীবন আবার পানির আরেক নাম মরণও। যদি সাঁতার না জানে। যে সাঁতার জানে না তার জীবনের ষোল আনাই বৃথা। ক্রীড়া ও আনন্দ লাভের জন্য পানির উপর ভেসে থাকা এবং সামনে অগ্রসর হওয়াকে সাঁতার বলে। সাঁতার কে বলা হয় সর্বোতকৃষ্ট পূর্ণাঙ্গ ব্যায়াম। যা দেহের সকল অঙ্গের কাজ করে প্রাচীন কালে মানুষ যখন গুহায় বাস করত তখন থেকেই মানুষের জীবন রক্ষার তাগিদ থেকে সাঁতারের উদ্ভব। স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার জন্য সকলের সাঁতার শেখা উচিত। সাঁতার জানা না থাকলে পানিতে পড়ে গেলে সে আর বাঁচতে পারবে না। তা সে যতই প্রভাবশালী আর বিত্তশালী কিংবা জ্ঞানী গুণী ইউক না কেন? পানি তাকে রক্ষা

করবেন না। সাঁতার জানলে সে নিজের জীবনের পাশাপাশি অন্যের জীবনও রক্ষা করতে পারে। সাঁতার জানা না থাকলে হাটু পানিতে পড়েও মানুষ মারা যায়।

সাঁতারের প্রকার ঃ প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার চার প্রকার। ১) ফ্রি স্টাইল/মুক্ত সাঁতার ২) ব্যাক ষ্ট্রোক/চিৎ সাঁতার ৩) ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক/বুক সাঁতার ৪) বাটার ফ্লাই/প্রজাপতি সাঁতার।

১) ফ্রি স্টাইল/মুক্ত সাঁতার ঃ এই সাঁতারে একজন প্রতিযোগি যে কোন কায়দায় সাঁতার কাটতে পারে।

২) ব্যাক ষ্ট্রোক/চিৎ সাঁতার ঃ এই সাঁতার পানির উপর চিৎ হয়ে মাথাকে অর্ধেক পরিমাণ পানির ভিতরে নিয়ে নাক পানির উপর রেখে শরীর পানির উপর সমান্তরাল রেখে হাত কানের দুপাশ দিয়ে একের পর এক হাত বৈঠার মত পানি কাটবে ও দুই পায়ের পাতা পানির উপর উঠানামা করবে।

৩) ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক/বুক সাঁতার ঃ পানিতে বুকের উপর ভর করে এই সাঁতার কাটতে হয় বলে একে বুক সাঁতার বলে। দেহ থাকবে পানির উপরিভাগে সমান্তরাল, দেহের পিছনের কিছুটা অংশ পানির মধ্যে থাকবে পানির উপরে, হাত ও পায়ের কাজ শেষে শরীর যখন সামনে এগুবে তখন নাক ও মুখ পানির কিছুটা নিচে যাবে। দুই পা একসাথে থাকবে। দুই হাত মাথার সামনে লম্বা করে ফেলে দুই হাত দিয়ে শরীরের দুই পাশে পানি কেটে টেনে আনতে হবে। এ সময় দুই হাটু ভাঁজ করে পানির নিচে যাবে ও দুই গোরালি কোমরের কাছাকাছি এনে জোড়ো পানিতে ধাক্কা দিতে হবে এবং একই সাথে দুই হাত সামনে প্রসারিত করে পানি কেটে শরীরের দুদিকে আসার সময় কনুই সামান্য খাঁজ হবে। পানি কেটে আসার পর আবার মুখের সামনে দুই হাত একত্রিত করে সামনে নিতে হবে। এ সময় নাক, মুখ ও কপালের কিছুটা পানির মধ্যে থাকবে। দুই হাত প্রসারিত করার পর যখন শরীরের দুপাশে পানি কেটে আনবে তখন মুখ পানি থেকে উপরে উঠিয়ে শ্বাস নিয়ে পানির মধ্যে নিশ্বাস ছাড়তে হবে।

৪) বাটার ফ্লাই ষ্ট্রোক/প্রজাপতি সাঁতার ঃ চার প্রকার সাঁতারের মধ্যে বাটার ফ্লাই ষ্ট্রোকের সাঁতার সবচেয়ে কঠিন। এর কলাকৌশল অর্জনে সাঁতারুকে প্রচুর অনুশীলন করতে হয়। অন্য সকল ষ্ট্রোকের মত শরীর যথাসম্ভব পানির উপর সমান্তরাল অবস্থানে থাকবে। যেহেতু শরীরকে সামনে এগিয়ে নিতে হয় এবং মাথা উঠিয়ে শ্বাস নিতে হয় তাই শরীরে পিছনের অংশটুকু অল্প পানির নিচে থাকে। দুই পা জোড়া অবস্থায় থাকবে। কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত যত বেশী নমনীয় (Easy) থাকবে তত জোর পানিতে জোড়া পায়ে আঘাত করা যাবে। ডলফিন মাছ

যেভাবে পানিতে লেজের সাহায্য ধাক্কা দেয় তেমনি পা দুটিকে একটু হাঁটু ভেঙ্গে নিচে ও পিছনে পানিতে ধাক্কা দিতে হবে। সাথে সাথে দুই হাত একসাথে মাথার সামনে নিক্ষেপ করতে হবে ও দুই হাত একসাথে মাথার পানিতে চাপ দিয়ে শরীরে সামনে এগিয়ে নিতে হবে ও সাথে সাথে ডলফিন কিকের সমন্বয় ঘটাতে হবে। দুই হাত পানির ভিতর থেকে উঠিয়ে দেহের দুই দিকে সাম্প্রতিক করে সামনে ফেলা হয় বলে অনেকটা প্রজাপতির পাখার মত দেখতে হয় বলে একে বাটার ফ্লাই ষ্ট্রোক/প্রজাপতি সাঁতার বলে।

সাঁতারের উপকারিতা ঃ সাঁতার কেবল একটি সাধারণ ব্যায়ামই নয়। কেউ নিয়মিত সাঁতার কাটলে তার উপকারিতা সুদূরপ্রাসারী। সাঁতারের উপকারিতা ঃ

- ❖ হৃৎপিন্ড, ফুসফুসের কার্যদক্ষতা বাড়ে।
- ❖ সাঁতারে রক্ত সঞ্চালনের গতি বাড়ে।
- ❖ সাঁতার শরীরের নমনীয়তা বাড়ায়।
- ❖ সাঁতারে ওজন কমে।
- ❖ হার্টের অসুখ কমায়।
- ❖ মানসিক চাপ কমে।
- ❖ নিয়মিত সাঁতার কাটলে মন প্রফুল্ল এবং মস্তিস্ক ভালো কাজ করে।

গ) ২ জন দেশী ও ২জন বিদেশী খ্যাতনামা সাঁতারুর নাম জানা

❖ দেশী সাঁতারুর মধ্যে রয়েছেন- সাঁতারু ডলি আক্তার, সাঁতারু সোনিয়া আক্তার, সাঁতারু জুয়েল, সাঁতারু কারার সামেদুল ইসলাম, সাঁতারু মাহফিজুর রহমান আরো অনেকে।

❖ বিদেশী সাতারু- Katie Ledecky, Sun Yang, Kosuke Hagino, Adam Peatu, ect.

৩. নিরাপত্তা ঃ

ক. নিকটস্থ থানার অবস্থান ও ফোন নম্বর জানা

থানা একটি দালান বা ঘর যাতে পুলিশ কর্মকর্তা ও তাদের অধীনস্ত ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ তাদের অর্পিত দায়িত্ব পালন করে। কোন কোন থানায় পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ বসবাসও করে। একটি থানায় কর্মকর্তাদের জন্য পৃথক অফিস ক্ষ, আসামীদের জন্য হাজতখানা ও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আলাদা কক্ষ থাকে।

বাংলাদেশ পুলিশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পুলিশ বাহিনীর মতো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাম জনগণের জানমাল ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, অপরাধ প্রতিরোধ ও দমনে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু আইন পালন আর অপরাধ প্রতিরোধ বা

দমনই নয় দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গত এক দশকে জঙ্গীবাদ দমন এবং নিয়ন্ত্রনে বাংলাদেশ পুলিশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। পুলিশের সদস্যরা তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর পেশাদায়িত্ব দিয়ে অপরাধ মোকবিলায় প্রতিনিয়ন সৃজনশীলতার পরিচয় দিচ্ছেন। বাংলাদেশ পুলিশের প্রধান হলেন মহা পুলিশ পরিনদর্শক। (IGP)। যে কোন সেবা পাওয়ার জন্য অবস্থান ও টেলিফোন নম্বর জানা খুবই জরুরী। তুমি তোমার জেলার বা উপজেলার থানার অবস্থান ও ফোন নম্বর জেনে রাখবে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য শাখা ঃ ০২-৭১২৬৩০০, তথ্য অফিসার ঃ ০২-৯৫৬৬৯৯৮ তে ফোন করেও তোমার নিকটস্থ থানার খবর জানতে বা কোন তথ্য জানাতে পারবে।

খ. বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স (ইংরেজি Fire Service and Civil Defence) বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮২ সালে গতি, সেবা ও ত্যাগের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে কার্যক্রম আরম্ভ করে। প্রথম সাড়া প্রদানকারী সংস্থা (First Responder Organization) হিসেবে এ বিভাগের কর্মীরা অগ্নি নির্বাপণ, অগ্নি প্রতিরোধ, উদ্ধার, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, মুমূর্ষু রোগীদের হাসপাতালে প্রেরণ ও দেশী-বিদেশী ভিআইপিদের অগ্নি নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনাতকারী সংস্থা হিসেবে যা সব ধরনের প্রাকৃতিক ও মানবিক দুর্ঘটনায় উদ্ধারকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। যেকোন দুর্ঘটনায় সাহায্যের প্রয়োজনে ফায়ার সার্ভিসের জরুরি টেলিফোন নাম্বার অর্থাৎ হটলাইন হল ১০২ এবং তথ্য কেন্দ্রের নম্বর হল ০২-৯৫৫৫৫৫৫। তুমি তোমার নিকটস্থ ফায়ার সার্ভিসের অবস্থান ও ফোন নম্বর জেনে রাখবে।

গ) রাস্তায় হেঁটে চলাচল করার সময় পালনীয় পথ চলার নিয়ম বলতে পারা ঃ
রাস্তায় হেঁটে চলাচল করার সময় অবশ্যই কিছু নিয়ম তোমাদের পালন করতে হবে। কারণ রাস্তায় যানবাহনের দৌরাত্ম্য এড়িয়ে চলতে হয়। তুমি যদি শহরের কাব স্কাউট হও তাহলে তোমাকে এসব নিয়ম কানুন ভালভাবে না জেনে রাস্তায় বের হওয়াই উচিত নয়। তবে যানবাহনের ভিড় থাকা সত্ত্বেও তোমাকে রাস্তায় চলতে হবে। এর জন্য নিয়ম মাফিক চলতে হবে।

যেমন সর্বদা রাস্তার ডানে চলবে। রাস্তা পারাপারের সময় প্রথমে ডানে, পরে বামে এবং উভয় পাশে ভালভাবে দেখে রাস্তা পার হতে হবে। বড় শহের জেব্রা ক্রসিং দেওয়া আছে। জেব্রা ক্রসিং ধরে রাস্তা পার হবে।

ঘ. ভূমিকম্প হলে করণীয় ঃ
ভূমিকম্প বা ভূকম্পন ঃ ভূ মানে পৃথিবীর আর কম্পন হলো কাঁপা; সোজাভাবে ভূমিকম্প হলো পৃথিবীর কেঁপে ওঠা। তার মানে পৃথিবী যখন কাঁপে তখন আমরা

তাকে ভূমিকম্প বলি। ভূমিকম্প বলতে পৃথিবীপৃষ্ঠের অংশবিশেষের হঠাৎ অবস্থান পরিবর্তন বা আন্দোলনকে বোঝায়। হঠাৎ বুঝতে পারলে তোমার ঘরের কোনো জিনিস নড়ছে, দেয়ালের ঘড়ি, টাঙানো ছবিগুলো নড়ছে, তুমিও ঝাঁকুনি অনুভব করছ, তখন বুঝতে হবে ভূমিকম্প হচ্ছে।

পৃথিবীতে বছরে গড়ে ছয় হাজার ভূমিকম্প হয়। তবে এগুলোর অধিকাংশই মৃদু যেগুলো আমরা টের পাই না। সাধারণত তিন ধরনের ভূমিকম্প হয়ে থাকে- প্রচন্ড, মাঝারি, মৃদু। ভূমিকম্প হলে সর্ব প্রথম যেটা করণীয় সেটা হল- মাথা ঠান্ডা রাখারা, স্থির থাকা, উত্তেজিত না হওয়া। এটা জরুরী এই জন্য যে, উত্তেজিত হলে করণীয় বিষয় কী তা ঠিক করা কঠিন হবে

ভূমিকম্পের সময় করণীয় ঃ

১. ভূমিতকম্পের প্রথম ঝাঁকুনির সাথে-সাথে পরিবারের সবাইকে নিয়ে খোলা স্থানে আশ্রয় নাও।

২. যদি ঘর থেকে বের হতে না পারেন তবে, ইটের গাথুনির পাকা ঘর হলে- ঘরের কোনায়, কলাম ও বিমের তৈরী ভবন হলে- কলামের গোড়ায় আশ্রয় নাও।

৩. তোমার বাসস্থান আধাপাকা বা টিনের বা মাটির তৈরী হলে কাঠের টেবিল বা খাটের নিবে আশ্রয় নেও।

৪. ভূমিকম্প রাতের বেলায় হলে কিংবা দ্রুত বের হতে না পারলে সজাগ হওয়ার সাথে সাথে ঘরের কোনে, কলামের গোড়ায় কিংবা শক্ত খাট বা কাঠের টেবিলের নিচে আশ্রয় নাও।

৫. ঘরে হলেমেট জাতীয় কিছু থাকলে দ্রুত নিজের মাথায় পর ও অন্যদের পরতে বল।

৬. রাতে ঘুমানোর সময় ভূমিকম্প হলে কোন হুড়াহুড়ি না করে গড়িয়ে মেঝেতে কুন্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড় বিছানাকে ঢাল বানিয়ে।

৭. বিল্ডিং ভেঙ্গে পড়ার সময় সিলিং যখন কোন কিছুর ওপর পড়ে একে গুঁড়িয়ে দেয়, ঠিক তার পাশেই ছোট্ট একটি খালি জায়গায় সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় 'সেফটি জোন' বা 'ট্রায়াঙ্গল অফ লাইফ'। তাই ভূমিকম্পের সময় বড় কোন সোফা বা বড় কোন জিনিসের পাশে আশ্রয় নিলে বাঁচার সম্ভবনা বেশি থাকে।

৮. ভূমিকম্পের সময় জানালা বা বারান্দা দিয়ে লাফ দেয়া এসবও করবেন না।

৯. এই সময় কোনমতেই লিফট ব্যবহার করবেন না। কেননা বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে লিফট বন্ধ হয়ে তুমি সেখানে আটকা পড়তে পার।

১০. ভূমিকম্পের সময় কখনই সিঁড়িতে আশ্রয় নেবে না।

১১. বড় ভূমিকম্পের পরপরই আরেকটা ছোট ভূমিকম্প হয় যেটাকে 'আফটার শক' বলে। এটার জন্যও সতর্ক থাক।

ঙ. হারিকেনের চিমনি পরিস্কার করে হারিকেন লাগাতে ও হারিকেন জ্বালাতে পারা ঃ

হারিকেন হচ্ছে জ্বালানি তেলের মাধ্যমে বদ্ধ কাচের পাত্রে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা। এর বাহিরের অংশে অর্ধবৃত্তাকার কাচের অংশ থাকে যাকে আমরা চিমনি বলে থাকে, এর ভিতরে থাকে তেল শুষে অগ্নি সংযোগের মাধ্যমে আলো জ্বালাবার জন্য থাকে কাপড়ের সলাকা। আর সম্পূর্ণ হারিকেন বহন করবার জন্য এর বহিরাংশে একটি লোহার ধরুনি থাকে, আলো কমানো বা বাড়ানোর জন্য নিম্ন বহিরাংশে থাকে একটি চাকটি যা কমালে বাড়ালে শলাকা ওঠা নামার সাথে আলোও কমে ও বাড়ে। একসময় আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এর ব্যবহার বেশি ছিল। তবে এখনো রিক্সার নিচে আলোর উৎস হিসেবে হারিকেন ব্যবহৃত হয়। যদি তোমার বাসায় বা ডেনে হারিকেন থাকে তাহলে তা জ্বালানোর নিয়ম ও চিমনি পরিস্কার করার উপায় জেনে নেবে।

গ) মোমবাতি জ্বালিয়ে ১০ কদম মুক্ত হাওয়ার হাঁটতে পারা ঃ হয়ত ভাবছ মোমবাতি জ্বালিয়ে ১০ কদম হাঁটা খুব সোজ কাজ। তোমার ধারণা ভুলও হতে পারে। বাস্তবে তার প্রমাণ করার জন্য একটি জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে মুক্ত হাওয়ায় হাটতে চেষ্টা কর। এক কদম, দুই কদম, তিন কদম না যেতেই হয়ত প্রথম বারে তোমার হাতের জ্বলন্ত মোমবাতিটি নিভে গেছে. বার বার চেষ্টার পর একবার দেখবে ১-২ করে ১০ কদম জ্বলন্ত মোমবাতিটি নিয়ে মুক্ত হাওয়ায় হাঁটতে পারছ। তোমাদের পাকের সকল কাব প্রতিযোগিতামূলকভাবে আকেলার কাছে এর পরীক্ষা দেবে এবং ব্যাজ অর্জন করতে আগ্রহী হবে। জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে হাঁটার সময় সাবধান হতে হবে যাতে জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে পড়ে।

৪. পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

ক. পানি, বায়ু ও মাটি দূষিত হওয়ার কারণ ও তা প্রতিরোধের উপায় জানা (১টি করে)।

তুমি যেখানেই থাক না কেন তোমার চার পাশের সবকিছু নিয়েই তোমার পরিবেশ। তোমার উপর রয়েছে পরিবেশের প্রভাব। আবার পরিবেশের উপর রয়েছে তোমার প্রভাবঅ। বেঁচে থাকার জন্য আমরা পরিবেশকে নানাভাবে ব্যবহার করি। যার ফলে পরিবেশে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। এসব পরিবর্তন যখন আমাদরে ক্ষতি করেন, তখন তাকে আমরা বলি পরিবেশ দূষণ।

পরিবেশ দূষণের কারণ ঃ বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে পরিবেশে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষ পরিবেশের উপাদানকে নানাভাবে ব্যবহার করছে। বিভিন্ন বর্জ্য সৃষ্টি করছে। ফলে পরিবেশের পানি, বায়ু ও মাটি দূষিত হচ্ছে।

পানি ঃ তোমরা হয়ত লক্ষ্য করছে যে, তোমাদের এলাকার পানি নানাভাবে দূষিত হচ্ছে। যে পানিতে ময়লা, আবর্জনা ও রোগজীবাণু থাকে তাকে দূষিত পানি বলা হয়। পানি দূষিত হওয়ার একাধিক কারণ রয়েছে তার মধ্যে একটি কারণ পানিতে ময়লা, আবর্জনা, খড়কুটা, মৃত জীবদেহ ইত্যাদি ফেললে পানি দূষিত হয়। এইসব জিনিস যেন পুকুরে না ফেলা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বায়ু ঃ বায়ু একটি অমূল্য সম্পদ। এই পৃথিবীর কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ বায়ু ছাড়া বাঁচতে পারে না। এই অমূল্য সম্পদ বায়ু নানা কারণে দূষিত হয়। যে বায়ুতে দূষিত গ্যাস, ধুলিকণা ও রোগজীবাণু থাকে তাকে দূষিত বায়ু বলে। বায়ু দূষিত হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে আবর্জনা, থুথু, কফ যেখানে সেখানে ফেললে সেগুলো থেকে জীবাণু বাতাসের সাথে মিশে বাতাসকে দূষিত করে। বাতাসকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলে মাটি চাপাদিতে হবে। মৃত জীবজন্তুর দেহ মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে।

মাটি ঃ যে মাটির উপর আমরা বাস করছি, সে মাটিকে আমরা নানাভাবে ব্যবহার করছি। যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে মাটিরও ক্ষয় হচ্ছে। মাটির উপর লাগানো গাছপালা বেড়ে উঠলে মাটির ক্ষয় রোধ হয়। অবাধ গাছপালা কাটা রোধ করতে হবে। বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। অতিরিক্ত বিষাক্ত ও রাসায়নিক দ্রব্য মাটিতে ফেললে বা মাটিতে পলিথিন ফেললে মাটি তার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা বা উর্বরতা হারায়।

খ. মাটি কি কি উপকারে আসে তা বলতে পারা ঃ আমাদের বসতবাড়ি, বিদ্যালয়, হাট-বাজার, খেলার মাঠ, খেত খামার সবই স্থলভাগে অবস্থিত। শৈশবে মায়ের কোলে আমরা নিরাপদ আশ্রয় পাই। ঠিক তেমনি এই মাটির বুকে ঘর বেঁধে আমরা নিরাপদে বাস করি।

এই মাটিতে উৎপন্ন ফসলই আমাদের খাদ্য যোগায়। তাই মাটি মায়ের মত। আমাদের পরিধেয় বস্ত্র তৈরির উপাদানও মাটি থেকেই পাই। মাটির উপর সকল প্রাণী জীবন অতিবাহিত করছে সুখে শান্তিতে।

গ. একটি গাছের চারা নিজ বাড়িতে অথবা বিদ্যালয় অঙ্গনে লাগিয়ে অন্ততঃ দুইমাস যত্ন নেওয়া।

আলো বাতাস পায় এমন একটি উর্বর জায়গায় ফল/ফুল/সবজির/ঔষধি গাছের চারা লাগিয়ে তা কমপক্ষে ২ মাস পরিচর্চা করবে।

ঘ. পার্ক বা বাগান বা বিদ্যালয় অঙ্গন বা রাস্তার আবর্জনা পরিস্কার অভিযানে এক সঙ্গে ১ ঘন্টা করে সর্বমোট ৩ ঘন্টার কাজে অংশগ্রহণ করা ঃ পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার জন্য কাব স্কাউট হিসেবে তোমাদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তোমরা

যষ্ঠক ভিত্তিক তোমাদের আশপাশে কোন পার্ক বা বাগানের আবর্জনা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে পরিস্কার করবে। তোমাদের ১ ঘন্টা করে কজের মাধ্যমে পরিবেশ কত সুন্দর হবে এবং সমাজে বসবাসকারী লোকজন তোমাদের এ কাজকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। পরিবেশের দূষণ কিভাবে রোধ করা যায় তার চেষ্টা করবে। তোমরা ১ ঘন্টার জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন করে এ কাজ করলে অন্য ছাত্র/ছাত্রীরাও তোমাদের এ কাজ অনুসরণ করবে এবং যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকবে।

ঙ. কাব স্কাউট অভিযানে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কাজে অংশগ্রহণ করা ঃ কাব স্কাউট প্রোগ্রামের কাব অভিযান একটি আনন্দময় সুন্দর প্রোগ্রাম। অভিযানে তোমরা অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। গন্তব্যস্থান তোমরা জানবে না। তোমরা অজানাকে জানার চেষ্টা কতরবে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নতুনের আবিস্কার করবে। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করবে। এর মূল বিষয় প্রকৃতিতে নানাবিধ জিনিস রয়েছে, যেমন স্থলচর প্রাণী, উভচর প্রাণী, জলচর প্রাণী, উদ্ভিদ, লতানো উদ্ভিদ, কাঁটা জাতীয় গাছ, অপুষ্পক ও সপুষ্কক উদ্ভিদ ইত্যাদি সংগ্রহে এবং তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃতিকে জানতে পারবে।

৫. রংধনু গ্রুপ (সবু) ব্যক্তিগত দক্ষতা ঃ

যারা ছাত্রছাত্রী তাদের প্রত্যেকের একটি করে বই সংগ্রহশালা প্রয়োজন। অর্থাৎ একটি ব্যাক্তিগত লাইব্রেরী কাবদের জন্য তো অপরিহার্য। তুমি বিভিন্ন ধরনের বই তোমার লাইব্রেরীতে সংগ্রহ করতে পার। যেমন- ধর্মীয় বই, বিখ্যাত মনিষীর জীবনী, উপদেশ মূলক বই, গল্পের বই তাছাড়া স্কাউট সর্ম্পকীত বই তো থাকবেই।

তুমি বিভিন্ন উৎস থেকে বই সংগ্রহ করতে পারো। যেমন- কোন উপলক্ষে বড়রা তোমাকে কিছু উপহার দিতে চায় তুমি তাদের কাছ থেকে বই উপহার নিতে পার।, সঞ্চয়ের টাকা খরচ করে তুমি বই কিনতে পার। এভাবে কমপক্ষে বিভিন্ন ধরনের ২০ টি বই সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিনিয়ত তোমাকে বইয়ের যত্ন নিতে হবে। অর্থাৎ যাতে বই নষ্ট না হয়, পোকা না ধরে তা খেয়াল রাখতে হবে।

কাব বন্ধুরা আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে শুধু বই সংগ্রহ করলে হবে না তোমাকে সংগৃহীত বই পড়তে হবে। তুমি প্রথমত কমপক্ষে ৩ টি বই পড়ে তা থেকে কি শিখেছো তা তোমার কাব লিডারকে জানাতে হবে।

৪. বই বাঁধাই ঃ

ক) সুতা পাকানো এবং সূচে সুতা পরাতে পারা ঃ প্রিয় কাবেরা কিছু কিছু ছোট কাজ আছে যা নিজেরাই করা যায় আর একজন কাব হিসেবে নিজের কাজ নিজে করার

জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। যেমন শার্ট প্যান্টের বোতাম লাগানো, নিজের ব্যবহারের খাতা সেলাই করা। এজন্য তোমাকে প্রথমে সূচে সুতা পরাতে শিখতে হবে। আর খাতা সেলাই করার জন্য সুতা পাকিয়ে একটু চেষ্টা করে নিলে ভালো হয়। কিভাবে সুতা পাকাতে হয় তা তোমাকে শিখতে হবে। এজন্য তুমি বড়দের সাহায্যে নিতে পার।

খ) নিজের ব্যবহারে জন্য খাতা কাগজ ভাঁজ করে সেলাই করতে পারা ঃ প্রিয় কাব স্কাউট বন্ধুরা তোমারা সকলেই তো ছাত্র ছাত্রী। আর লেখাপড়া করার জন্য অবশ্যই খাতার প্রয়োজন হয়। তৈরীকৃত খাতা কিনে ব্যবহার না করে তোমরা যদি কাগজ কিনে সেলাই করে খাতা তৈরী কর কেমন হয়।
তাতে তোমাদের খরচটাও কম হলো এবং খাতা সেলাই করাটাও শেখা হলো। খাতা সেলাই করতে হলে প্রথমে কাগজগুলোকে সুন্দরভাবে সমান ভাজ করে নিতে হবে তারপর মোটা কোন সুতা দিয়ে সেলাই করে নিতে হবে। সেলাইটা শেখার জন্য তুমি বড়দের সাহায্যে নিতে পারো।

গ) নতুন বইয়ের মলাট লাগাতে পারা ঃ নতুন বই সবার কাছেই একটি সবচেয়ে প্রিয় জিনিস আর কাবদের বেলায় তো কথাই নেই তাই না ছোট বন্ধুরা। নতুন বই হাতে পেলে মনটা কতইনা উৎফুল্লিত হয়। আর নতুন বই নতুন রাখার জন্য সকল ছাত্র-ছাত্রীরাই তো সচেষ্ট থাকেন এজন্য তোমাদের বইয়ের মলাট লাগাতে হবে। মলাট লাগাতে হলে প্রথমে বইটির জন্য বইয়ের মাপের চেয়ে একটু বড় করে শক্ত ধরনের কাগজ নিবে। বইটি কাগজটির মাঝখানে রাখ, এবার বইটি কাগজ দ্বারা মুড়িয়ে নাও। বইয়ের কভার পৃষ্ঠার সাথে মলাটের কাগজ ভিতর দিকে এটে দাও। এভাবে বইয়ের উভয় কভার পৃষ্ঠার সাথে মলাটের কাগজটি এঁটে দাও। এভাবেই তোমার বইটি সুন্দর ভাবে মলাটে আবদ্ধ এবং সুন্দর দেখাবে। এজন্য তুমি তোমার বড়দের সাহায্য নিতে পার।

রংধনু গ্রুপ হলুদ প্রাণীর যত্ন ঃ

১. কবুতর পোষা ২. মুরগী পালন

৩. হাঁস পালন ৪. কোয়েল পাখি পালন

১. কবুতর পোষা ঃ

ক) নিজ বাড়িতে এক জোড়া কবুতর তিন মাস পুষতে পারা ঃ প্রিয় কাব স্কাউট, তোমদের নিজ বাড়িতে বা বাসায় এক জোড়া কবুতর ৩ মাস পুষবে। এতে কবুতর পোষা সম্পর্কে তোমাদের সরাসরি ধারণা হবে।

খ) কবুতরের কয়েকটি জাতের নাম জানা ঃ বহুবিচিত্র ধরনের নানা জাতের কবুতর রয়েছে। আমাদের দেশে ২০ টিও অধিক জাতের কবুতর আছে বলে জানা যায়। এর মধ্যে গোলা, গোলী, টাম্বলার, লোটান লাহোরী, কিং, ফ্যানটেল, জ্যাকোবিন, মুকি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গ) কবুতরের কয়েকটি খাদ্যের নাম জানা ঃ কবুতরের খাদ্যে শ্বেতসার, চর্বি, আমিষ, খনিজ ও ভিটামিন প্রভৃতি থাকা প্রয়োজন। কবুতর তার দেহের প্রয়োজন এবং আকার অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। প্রতিটি কবুতর দৈনিক প্রয়ো ৩০-৫০ গ্রাম পর্যন্ত খাবার গ্রহণ করে থাকে। কবুতর প্রধানত গম, মটর, খেশারী, ভুট্টা, সরিষা, যব, চাল, ধান কলাই ইত্যাদি শস্যদানা খেয়ে থাকে।

ঘ) কবুতর বছরে কয়টি ডিম দেয় তা জানা ঃ একটি কবুতর সাধারণত বছরে ১০-১২ জোড়া ডিম দেয়।

ঙ) কবুতরের খোপ পরিস্কার করতে পারা ঃ কবুতরের ঘর বা খোপ এমনভাবে নির্মাণ করনতে হবে যেন সেখানে পোকা-মাকড়, কৃমি, জীবাণু ইত্যাদির উপদ্রব কম থাকে এবং ঘর সহজেই পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত করা যায়। তাদের বাসস্থান যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের মধ্যে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন এছাড়াও খোপ নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

২. মুরগী পালন ঃ

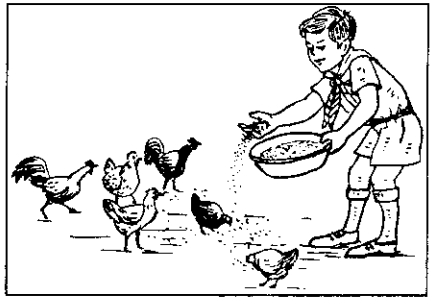

ক) নিজ বাড়ীতে ২টি মুরগী ৩ মাস পুষতে পারা ঃ কাব স্কাউট ভাই ও বোনেরা তোমাদের নিজ বাড়ীতে ২টি মুরগী ৩ মাস পুষবে। এতে মুরগী পালন সম্পর্কে তোমার সরাসরি ধারণা হবে।

খ) মুরগী খাদ্য কি কি বলতে পারা ঃ মুরগীর খাবারে ব্যাপারে তোমাকে জানতে হবে। মুরগীর সুষম খাবারের উপরেই মুরগীর বৃদ্ধি ও ডিম দেওয়া নির্ভর করে।

নিচে মুরগীর খাবারের তালিকা দেওয়া হল-
গম, ভুট্টা, চাউলের কুড়া বা গমের ভূষি, তিলের খৈল, শুঁটকি মাছে গুড়া, মাংসের উচ্ছিষ্ট, শামুক বা ঝিনুকের গুড়া ইত্যাদি এ সব খাবার বাড়িতে তৈরি করা যেতে পারে। একটি পূর্ণ বয়স্ক মুরগীর জন্য দৈনিক ১০০ গ্রাম খাদ্য দিতে হয়।

গ) মুরগীর দুইটি রোগের নাম জানা ঃ অন্য সব প্রাণীর মত মুরগীও নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হতে পারে। যেমন ১) রানীক্ষেত এবং ২) বসন্ত রোগ।

ঘ) উন্নত জাতের দুটি মুরগীর নাম জানা ঃ উন্নত জাতের মুরগীর মধ্যে ১) হোয়াইট লেগহর্ণ এবং ২) রোড আইল্যান্ড রেড উল্লেখযোগ্য।

ঙ) মুরগীর খোয়াড় পরিস্কার করতে পারা ঃ মুরগীর খোয়াড় পরিস্কার জীবানুমুক্ত রাখতে হবে এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

চ) মুরগীর ডিম মানুষের কীভাবে উপকারে আসে তা বলতে পারা ঃ মুরগীর ডিমে ভিটামিন রয়েছে। যা রাত কানা রোগ থেকে রক্ষা করে। ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম, ক্যালরী, আমিষ ও লৌহ থাকে। যা শরীরে শক্তি যোগায়।

৩. হাঁস পালনঃ

ক) নিজ বাড়ীতে ২টি হাঁস ও তিন মাস পুষতে পারা ঃ নিজ বাড়ীতে ২টি হাঁস ৩ মাস পুষবে, আর যদি তুমি হাঁসের প্রতি দুর্বল হয়ে পড় এটা এক সময় তোমার শখের কাজে পরিণত হতে পারে। হাঁসের সুষম খাবার, এদের থাকা ঘর কিভাবে পরিস্কার করতে হয় তা তোমাকে জানতে হবে। তোমার বাবা-মাকে বলবে তোমার হাঁস পালন ব্যাজের জন্য তোমাকে দুটি হাঁস পুষতে হবে। তারাও খুশি হয়ে তোমাকে উন্নত জাতের দুটি হাঁস কিনে দেবেন।

খ) হাঁসের খাদ্য কি কি বলতে পারা ঃ হাঁসকে সুষম খাদ্য প্রদান করতে হবে। নিম্নবর্ণিত নিয়মে সুষম খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে। যেমনঃ গম, চাউলের গুড়া-১২ কেজি, তিলের খৈল-৫ কেজি, মাছের গুড়া-৭ কেজি, ঝিনুক চূর্ণ-১ কেজি, ভিটামিন ও খনিজ লবন-২০০ গ্রাম। এগুলো কিনে তুমি নিজের উপকরণগুলো এক সাথে করে মিশিয়ে উন্নত ধরণের সুষম খাবার তৈরি করতে পার এবং সবুজ শাক-সবজিও দিতে পার। দিনে ৩-৪ বার খাবার দিতে হবে এবং পর্যাপ্ত পানি থাওয়াতে হবে।

গ) হাঁসের দুটি রোগের নাম জানা ঃ ১) হাঁসের অন্যান্য রোগের মধ্যে প্লেগ রোগ, একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগে মৃত্যুর খুব বেশি। প্রায় সব বয়সের হাঁস এ রোগের আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ২) কলেরা রোগ ঃ হাঁসের সব বয়সেস এ রোগ হয় ব্যাকটেরিয়া এ রোগের কারণ।

ঘ) উন্নত জাতের দুটি হাঁসের নাম জানা ঃ ১) খাকী কেম্বেল বিদেশী উন্নত জাতের হাঁস। এ জাতের হাঁস বছরে ২০০-২৫০টি ডিম পাড়ে। ২) জিনডিং - এ জাতের হাঁসও বিদেশী উন্নত। এ হাঁস বৎসরে ২০০-২৫০টি ডিম পাড়ে।

ঙ) হাঁসের ঘর পরিস্কার করতে পারা ঃ প্রিয় কাব স্কাউট ভাই ও বোনেরা যে ঘরটিতে হাঁস থাকবে, সে ঘরটি ও বিভিন্ন পাত্র সব সময় পরিস্কার রাখতে হবে। ঘরের মেঝেতে কাঠের গুঁড়া বা তুষ তিন থেকে চার ইঞ্চি পুরু করে বিছিয়ে দিলে ভাল হয়। মেঝে পাকা হলে জীবাণুনাশক ফিনাইল, লাইজল ও আইওসান ঔষধ দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এক সপ্তাহ পর পর কাঠের গুড়া, তুষ পাল্টাতে হবে।

কোয়ের পাখি পালন ঃ

ক) নিজ বাড়িতে তিন মাস ২টি কোয়েল পাখি পালন করতে পারা ঃ প্রিয় তকাব স্কাউট, তোমাদের নিজ বাড়িতে বা বাসায় ২টি কোয়েল পাখি ৩ মাস পুষবে। এতে কোয়েল পাখি পালন সম্পর্কে তোমাদের সরাসরি ধারণা হবে।

খ) কোয়েল পাখির খাদ্য কি কি তা বলতে পারা ঃ কোয়েল পালনে তেমন খরচে নেই এই কারণেই বলা হয়ে থাকে যে, কোয়েলের জন্য আলাদা তেমন কোন সুষম খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হবার পর কিছুটা বিশেষ যত্ন প্রয়োজন হয়। এই সময় কোয়েলের বাচ্চাকে সুষম খাদ্য প্রদান করতে হয়।

সাধারণভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ বয়সের কোয়েল দিনে ২০ থেকে ২৫ গ্রাম পর্যন্ত খাবার গ্রহণ করতে পারে। এদের খাদ্যে আমিষ ও ক্যালোরির পরিমাণ নিম্নোক্ত হওয়া উচিত। সাধারণভাবে প্রতি কেজি খাদ্য অনুপাতে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ আমিষ এবং ২৫০০ থেকে ৩০০০ কিলোক্যালোরি বিপাকীয় শক্তিহ বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। সাধারণভাবে হাস মুরগির যে খাবার সরবরাহ করা হয়ে থাকে তার মধ্যেই এ ই ধরনের আমিষ এবং ক্যালারি বিদ্যমান। সুতরাং হাস মুরগির জন্য যে খাবার আনা হয় তার থেকেও খাবার প্রদান করে কোয়েল পালন করা যায়। তবে কোয়েল খুব ঘন ঘন পানি পান করে। তাই কোয়েলের খাচায় কয়েকটি স্থানে পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে পানির পাত্র গুলো যেন খাঁচার সাথে শক্ত করে আটকানো থাকে। যাতে পানির পত্র উপচে বা উল্টে পড়ে কোয়েলের গা ভিজে না যায়।

গ) কোয়েল পাখির ২টি রোগের নাম জানা ঃ কোয়েলে তেমন কোন রোগ ব্যাধি নেই বললেই চলে। তবে মাঝে মাঝে কোয়েলকে রোগক্রান্ত হতে দেখা যায়। কোয়েলের বিভিন্ন রোগ ব্যাধির মধ্যে আমাশয় উল্লেখ্যযোগ্য।

ঘ) কোয়েল পাখির খোয়ার/খাঁচা পরিষ্কার করতে পারা ঃ লিটার বা খাঁচায় কোয়েল পালন করা সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। তাদের বাসস্থান যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের মধ্যে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

ঙ) কোয়েল পাখির ডিম মানুষের কিভাবে উপকারে আসে তা বলতে পারা ঃ সাধারণত একটি ভাল জাতের কোয়েল বছরে ২৫০ থেকে ৩০০ টি ডিম প্রদানে সক্ষম হয়ে থাকে। এদের ডিম খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। পুষ্টিমানের দিকে থেকে মুরগির ডিমের সাথে তা তুলনীয়। বিশেষ করে কোয়েলের একটি ক্ষুদ্র ডিমে যে পরিমাণ প্রেটিন রয়েছে একটি বড়ো আকারের মুরগির ডিমেও প্রায় সেই পরিমাণ প্রোটিন বিদ্যামান। অথচ, দামের দিক থেকে একটি মুরগির ডিমের বিনিময়ে চারটি কোয়েলর ডিম পাওয়া যায়।

ক্যাম্পিং

কাব স্কাউটিং এর পুরো সময় অন্ততঃ ১টি কাব কার্নিভাল, ১টি কাব অভিযান, ২টি কাব হলিডে, ১টি স্কাউটস ওন ও ১টি উপজেলা/জেলা/আঞ্চলিক/জাতীয় ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণ করা।